প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

ভারতীর একব্রতী সেবক
সুপণ্ডিত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্তের
করকমলে
শুভার্থিনী
সতী ঘোষ

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ বৈষ্ণবপদাবলীর রচনাকাল, অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য ও দার্শনিক তত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন যুগে রচিত পদাবলীর তুলনামূলক সমালোচনা, পরিশেষে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে সম্পূর্ণ একটি সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচনা করবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই মনে পোষণ করে আসছি।

'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ' গ্রন্থটি আমার সেই অভিলাষের প্রকাশ।

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে অনেকে অনেক গবেষণা করেছেন, অনেকে অনেক সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য সেই সব গবেষণা ও সমালোচনার সুযোগ আমি গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, যে সব গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেই সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের স্পষ্ট উল্লেখ আমার এই পুস্তকে করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমি সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ থেকে:

ডঃ সুকুমার সেনের 'History of Brajabuli Literature' ও 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (সম্পূর্ণ), শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' এবং শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম'।

আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, বৈষ্ণব দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এবং স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার এই পুস্তক প্রকাশ করে সারস্বত লাইব্রেরীর শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য ও শ্রীমান বিভাস ভট্টাচার্য আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছে। তারা

আমার আশীর্বাদভাজন। তাই শুধু ধন্যবাদ নয়, আমি তাদের আশীর্বাদ জানাই তাদের সারস্বত সাধনা সার্থক হোক।

বিশেষতঃ যে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হল, তারা যদি এর সাহায্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর অনির্বচনীয়তার সামান্য কিছু স্বাদও পায়, তা হলেই আমার গ্রন্থ রচনা সার্থক মনে করব।

বিনীতা
সতী ঘোষ

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যে
বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ

১

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার কাল ও তাহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বাংলা ভাষায় একটি বহুপ্রচলিত কথা আছে, "কানু বিনা গীত নাই"। কথাটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এতদূর প্রযোজ্য যে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ থেকে আজ পর্যন্ত যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, সব কিছুর মধ্যেই বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য মিশে রয়েছে। বাংলা ভাষা যখন সবেমাত্র প্রাকৃতের খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে, যখন প্রাকৃত ও বাংলার পার্থক্য ভালো করে বিশ্লেষণ করা যায় না, যখন আলো-আঁধারে মেশা সন্ধ্যালোকের মতো অস্পষ্ট একটি ভাষাকে বাংলা ভাষার সূচনা বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তখন সেই ভাষায় রচিত হয়েছিল প্রথম বাংলা কাব্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

এ কাব্যের ভাষার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

কে না বাঁশী বাএ বড়াই। কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়াই। এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ—রন্ধন॥

এ ভাষা যে বাংলা ভাষারই আদিরূপ তা বুঝতে কষ্ট হয় না আর এর অন্তর্নিহিত ভাব মাধুর্যের অবলম্বন যে বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা-কাহিনী তাও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী বলতে আমরা যে পদ-সমষ্টি বুঝি, তা হচ্ছে বৈষ্ণব 'মহাজন' পদাবলী—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তি রস থেকে উৎসারিত অপূর্ব কাব্য সাহিত্য। বাংলা কাব্য সাহিত্য সেই সম্পদেই অনির্বচনীয় গৌরবের অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট এবং এই পার্থক্যের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল, এই অনুমান স্বাভাবিক। এই অনুমানের স্বপক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করা যেতে পারে

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দে॥

—মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা-কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত আদিরসাত্মক কাব্য। আদিরসের আধিক্য এতদূর বিস্তৃত যে, কাব্যটি অশ্লীলতা দোষে বিশেষ দুষ্ট। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এটিকে কাব্য না বলে এখানকার আলোচনায় 'গ্রাম্য গীতিনাট্য' বলাই সঙ্গত। অপরপক্ষে বৈষ্ণব 'মহাজন' পদাবলী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের সমষ্টি; একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাবের রূপক ব্যাখ্যা এর মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে এবং এই পদগুলির অন্তর্নিহিত রস বিচার করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে একটি পর্যায়ক্রম আছে, যার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের অনুমোদিত সাধন স্তরের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব ও ভাষা জয়দেবের গীতগোবিন্দের একান্ত অনুসারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: ক্রীড়া রাধা বিরহ খণ্ডে —

স্তনের উপর হারে।
আল মান এ যে হেন ভারে।
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে।
সরস চন্দন পঙ্কে।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥

গীতগোবিন্দ : চতুর্থ সর্গে—

(দেশাখ রাগৈকতালী তালাভ্যাং গীয়তে)
স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারম্,
সা মন্নুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥ ১১ (ধ্রুবম্)
সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম॥ ১২ (রাধিকা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশ্বাসে।
সঘন ছাড়য়ে রাধা বসি এক পাশে।
ক্ষেপে সজল নয়নে,
দশ দিশে খনে খনে
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে॥

গীতগোবিন্দে :

শ্বসিত পবনমনুপম পরিণাহম্।
মদন দহনমিব বহতি সদাহম্॥ ১৩ (রাধিকা)
দিশি দিশি কিরতি সজল কণ-জালম্,
নয়ন নলিনমিব বিদলিত নালম্॥ ১৪ (রাধিকা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

দেখি পল্লব শয়নে
অঙ্গার রাশি সমানে ।
মুদয়ে নয়ন অতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে
দি অঁ গগনে নয়নে ।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩

গীতগোবিন্দে

নয়ন বিষয়মপি—কিশলয় তল্পম্ ।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পম্ ॥ ১৫ (রাধিকা)
ত্যজতি ন পাণি তলেন কপোলম্ ।
বালে শশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ (রাধিকা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

খনে হাসে খনে রোষে—
খনে কাঁপএ তরাসে ।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥

গীতগোবিন্দে

সা রোমাঞ্চতি শীৎ করোতি বিল পতুৎ কম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ ভ্রাম্যতি প্রকীলতি পতত্যুদ্ যাতি মূর্চ্ছত্যপি। ১৯

গীতগোবিন্দে পর্যাপ্ত-প্রকাশিত মধুর রসের অভিনবত্ব ও কান্তকোমল পদাবলীর সুর ঝঙ্কারই বাংলা বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রাণবস্তু। ভাব ও ব্যঞ্জনা, দুদিক থেকেই বাংলা বৈষ্ণব গীতি-কবিতার গভীরতম অনুপ্রেরণা গীতগোবিন্দ থেকে এসেছে ; কাজেই গীতগোবিন্দ যদিও সংস্কৃতে লেখা তবু গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম দুখানি কাব্যগ্রন্থ বলে মেনে নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক

দিয়ে দুখানি গ্রন্থে যেমন যথেষ্ট মিল আছে, তেমনি বহিরাকৃতির দিক দিয়েও এদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বহিরাকৃতির কথায় ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে সময়ে লেখা হয়, সে সময়টা সংস্কৃত-সাহিত্যে ক্লাসিক যুগের অবসান-যুগ। এই সময়ে অপভ্রংশ সাহিত্যের শিল্পরীতির কিছু কিছু সংস্কৃত-সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ করছিল এবং তারই ফলশ্রুতি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে যা নাটক তা নাটক, যা কাব্য তা কাব্য। অর্থাৎ সংস্কৃত নাটক রচনার কতকগুলি বিধিবদ্ধ রীতি আছে, কাব্য রচনার বেলাও তাই আর নাটক রচনার নিয়ম-কানুন কাব্য রচনার রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গীত, কাব্য ও নাটকীয় সংলাপের কিছু মিশিয়ে গীতগোবিন্দে যে সম্পূর্ণ নূতন একটি শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছিল তা সংস্কৃত-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; এই শিল্পরূপের অনুরূপ অপভ্রংশ-সাহিত্যে মেলে এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে ক্লাসিক যুগের অবসান-যুগে মহানাটকম্, গোপাল-কেলি চন্দ্রিকা ও গীতগোবিন্দ এই তিনখানি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থে এই নূতন শিল্পরূপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর Bengal's Contribution to Sanskrit Literature and Studies in Bengal Vaishnavism গ্রন্থে বলেছেন: The Gitagovinda with its erotic emotionalism has been claimed by the Chaitanya sect as one of its sources of religious inspiration; and Bengal Vaishnavism would regard the work not so much as a poetical composition of great beauty but as an authoritative religious text, illustrating the refined subtleties of its theology and Rasasastra.

* * * *

The literary form, in which the theme is presented, is extremely original. The work calls itself a kavya and conforms to the formal division into Cantos; but in reality, it goes much beyond the styreotype kavya prescribed by the

rhetoricians; and modern critics have found in it a lyric drama (Lassen) a pastoral drama (Jones) an opera (Levi), a melodrama (Pischel), and a refined yatra (Von Schroeder). As a creative work of art it has a form of its own, but it defies conventional classification.

* * * *

In its novelty and completeness of effect, Jaydeva's work therefore is unique in Sanskrit and can be regarded as almost creating a new literary genre. It does not strictly follow the Sanskrit tradition but bears closer resemblance to the spirit and style of Apabhramsa or vernacular poetry.

* * * *

It should not be forgotten that the Gitagovinda was composed in an epoch, when the classical literature was already on the declinc, and when it was possible for such irregular types to come into existence presumably through the choral and melodramatic tendencies of vernacular literature, which was by this time gradually coming into prominence.

* * * *

Jaydeva's Gitagovinda appears to be a remarkable example of such a type indicating as it does, an attempt to renew and remodel older forms of composition by absorbing the newer characteristics of Vernacular language and literature. That this was not an isolated attempt but an expression of a widespread literary tendency is indicated by the existence of a small but significant body of literature, which exhibits similar peculiarities. The editor of the "Gopalakeli Chandrika" (of Ramakrishna of Gujrat) which contains padavalis of the same

kind rightly draws attention to its quasi dramatic and choral peculiarities and touches upon its similarity to the Swang of North Western India as well as to the Yatra. The Mahanatak is another example of a so-called drama, which was undoubtedly influenced in form and spirit by popular literature.

পাশ্চাত্য সমালোচক উইলিয়ম জোন্‌স্‌ গীতগোবিন্দকে যে 'গ্রাম্য গীতিনাট্য' আখ্যা দিয়েছেন সেই আখ্যাটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আঙ্গিকের দিক থেকে অপভ্রংশ সাহিত্যের যে প্রভাব দেখা যাচ্ছে তা থেকে বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা-কাহিনী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই কাহিনীর মূল কোথায় আর ঠিক কবে থেকে বাংলা সাহিত্যে এর অনুপ্রবেশ। গীতগোবিন্দের অতি মধুর সুর ঝঙ্কারের প্রভাবে সকলেই বিমোহিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাহিনী-বিন্যাসে পরিমার্জিত রুচির অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

গীতগোবিন্দের প্রথমেই

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুব ! শ্যামস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধেগৃহং প্রাপয় ॥

শোনা মাত্রই

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে"র ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে; কিন্তু ব্যাখ্যাটা যখন হৃদয়ঙ্গম হয় যে বালক কৃষ্ণ এতই ছোট যে ঘনঘটা করে ঝড় বৃষ্টি এলে বড় বড় গরু তাড়িয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিতে যেতে ভয় পাবে, তাই নন্দ রাধাকে বলছেন কৃষ্ণকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে, তখন রাধা-কৃষ্ণের বয়সের এই অসামঞ্জস্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের—

"পীন-পয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চল করযুগশালী" মূর্তির বা মানিনী রাধার প্রতি তার উক্তি:

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ (প্রিয়ে) ॥

অথবা

শশিমুখি। তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূ—
যুব জন মোহ করাল কাল সর্পী।
তদুদিত ভয় ভঞ্জনায় যূনাং,
ত্বদধর সীধু সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥......ইত্যাদির অন্তর্নিহিত ভাব মাধুর্যের কতটা সঙ্গতি রস উপভোগের ক্ষেত্রে বজায় থাকে, সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার।

এ কথা অনস্বীকার্য যে গীতগোবিন্দের প্রাণবস্তু ধ্বনিমাধুর্য ও সুরঝঙ্কারই বাংলা গীতি-কাব্যকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে যুগে যুগে এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা-কাহিনী বর্ণনার তথাকথিত সমস্ত অশ্লীলতা দোষকে ছাপিয়ে উঠেছে ঃ

"জয় জয় দেব হরে।"
শ্রীজয়দেবচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃত কৃত কলিকলুষ জ্বর খণ্ডনে ॥
(নিজগাদ সা)।

গীতগোবিন্দে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কিশোরী রাধিকার প্রণয়-লীলার ছবি থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অপ্রাকৃত ব্রজধামে চির কিশোর কিশোরীর প্রণয়-লীলার আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা পুষ্টিলাভ করেছে এবং শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মহিমায় গীতগোবিন্দের অনুপ্রেরণা বাংলা বৈষ্ণব কাব্যকে শুধু কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিকতারও সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা বৈষ্ণব

কবিতার গীতি প্রবণতা ও তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা এই দুয়েরই বীজ গীতগোবিন্দে নিহিত ছিল।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে গীতগোবিন্দের কবি, প্রেমিক কবি, রসিক কবি, যথার্থ কবিত্বগুণের অধিকারী শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তাই গীতগোবিন্দের কাহিনী বিন্যাসে পরিমার্জিত রুচির অভাব ও আদিরসের আধিক্য ঘটিত অশ্লীলতা দোষের কি কারণ থাকতে পারে, তা বিচার সাপেক্ষ।

অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব থেকেই অনুমান হয় যে, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলামূলক লৌকিক কাহিনী, গীত, নাটযাত্রা ইত্যাদি থেকে বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছিল বলেই জয়দেবের কাব্য অশ্লীলতা দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। লৌকিক কাহিনী, গীত, ছড়া, পাঁচালী ধরনের নাটযাত্রা ইত্যাদি কেন যে জয়দেবের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তারও কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনার আগে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে পাল রাজাদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। পাল রাজাদের সম্বন্ধে Richardson তাঁর Asiatic ·Researches (Vol IX) গ্রন্থে বলেছেন :

The Pal or Shepherd dynasty ruled in Bengal from the 9th to the latter part of the 11th century and if we place trust in the monumental inscriptions, the Abhirs were for sometime the universal monarchs of India. এখানে দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রিচার্ডসন পাল রাজাদের আভীর বলে এবং Shepherd dynasty অথবা গোপালক বংশ বলে অভিহিত করেছেন।

এই আভীর জাতি সম্বন্ধে Sir Henry M. Eliot মন্তব্য প্রকাশ করেছেন : Abhirs were also at one time Rajas of Nepal at the beginning of our era and they are perhaps connected with the Pala or Shepherd dynasty which ruled in Bengal in the eleventh century.

শুধু যে একাধিক বিদেশী সমালোচক আভীর জাতিকে গোপালক জাতি বলে অভিহিত করেছেন, তা নয়। 'কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়' পাওয়া যায়

পশুপালাস্ত্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুর্জরাস্তথা।
গোপপল্লব পর্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবা।

হরিবংশে যদুবংশের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাদের গোপালক এবং আনর্ত বা মথুরাবাসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হর্যশ্বশ্চ মহাতেজা দিব্যে গিরিবরোত্তমে
নিবেশয়ামাস পুরং বাসার্থ মমরোপম্।
আনর্তং নাম তদ্রাষ্ট্রং সুরাষ্ট্রং গোধনাসুতম্
অচিরেনৈব কালেন সমৃদ্ধং প্রত্যপদ্যতে।
মধুমতাং সুতো যজ্ঞে যদুর্নাম মহাযশাঃ
সোঽবর্দ্ধত মহাতেজা যদু দুন্দুভিনিস্বনঃ ॥
রাজলক্ষণসম্পন্ন সপত্নৈর্দুরতিক্রমঃ
যদুর্নামোঽভবৎ পুত্রো রাজলক্ষণ পূজিতঃ ॥

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশাধিপতি, এবং মুষলপর্বে শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনেই যদুবংশের আন্ধক বৃষ্ণ প্রভৃতি শাখা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে যদুবংশ ধ্বংস হবে জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে দিয়ে যাদব রমণীদের প্রভাসতীর্থে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একদল দস্যু যাদব রমণীদের অপহরণ করে নিয়ে যায়, এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন যাদব রমণীদের রক্ষা করতে অসমর্থ হন। এর থেকে অনুমান হওয়া স্বাভাবিক যে, অপহৃতা যাদব রমণীকুল ও দস্যুদলের মিলনে আভীর জাতির উৎপত্তি এবং এই জন্যই আভীর জাতিকে যদুবংশ সমোদ্ভব বলা হয়েছে।

একাধিক ঐতিহ সিকের মতে (Richardson এবং Henry M. Eliot) আভীর জাতির সঙ্গে পাল রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং 'পাল' কথাটি সম্ভবতঃ 'গো-পাল' কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

আভীর জাতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা-কাহিনী পূজিত হতো। The Struggle for Empire গ্রন্থে বলা হয়েছে: The Rasa had a long and varied past. It was known to several Puranas and Sanskrit rhetorical works as a type of group dance specially associated with the divine cowherd Krishna and Gopis and hence by implication also with the cowherd community of the Abhiras. (H. C. Bhayani)

বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতানুসারে পাল রাজারা আভীর জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত এবং এর থেকেই অনুমান হয় যে, নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন বাংলা দেশ পাল রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময়ে রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যময় প্রণয়-লীলা-কাহিনীমূলক লৌকিক গীত-ছড়া, নাটযাত্রা ইত্যাদি বাংলা দেশে প্রচলিত হয় এবং এরই পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে কবি গোবর্দ্ধনাচার্য, কবি উমাপতিধর এবং কবি ধোয়ীর উল্লেখ আছে।

গীতগোবিন্দ : প্রথম সর্গ, শ্লোক ৪—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্দ্ধন :
স্পর্দ্ধা কোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি : ॥

কবি গোবর্দ্ধনাচার্য, কবি উমাপতিধর, এবং কবি ধোয়ীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, জয়দেব এঁদের সমসাময়িক কবি। গোবর্দ্ধনাচার্য, উমাপতিধর এবং ধোয়ী লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন।

গোবর্দ্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে আছে ঃ

সকলকলা কল্পয়িতুং প্রভু প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ ॥

১২০১ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দেশ জয় করেন। কাজেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল অনুমান করা যায় এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন জয়দেবের সমসাময়িক রচনা তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাংলা দেশের লোক-সাহিত্যে অর্থাৎ লৌকিক গীত, ছড়া, নাটযাত্রা ইত্যাদিতে রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যময় প্রণয়-লীলা-কাহিনীর প্রথম অনুপ্রবেশ নবম থেকে একাদশ শতাব্দীতে আর এর পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে। বাংলা দেশে পাল রাজাদের অধিকারভুক্ত থাকা কালীন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বের সময়েই কর্ণাটগত সেন রাজারা বাংলার কিছু অংশ দখল করেছিলেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১১৫০ খৃষ্টাব্দে) সেন-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন বিজয় সেন। সাহাবুদ্দিন ঘোরী জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে তখন স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। লক্ষণসেনের বীরত্ব ও মহাত্ম্য সম্পর্কে মিনহাজ লিখছেন “রায় লখমনিয়া মহারাজা (Great Rai) ছিলেন, হিন্দুস্থানে তাঁহার মত সম্মানিত রাজা আর কেহ ছিল না।” (বাঙালীর ইতিহাস ঃ নীহাররঞ্জন রায়)। লক্ষণ সেন যে কত বড় প্রতিপত্তিশালী এবং খ্যাতিমান রাজা ছিলেন তার একটা প্রমাণ ‘লক্ষণশংবৎ’এর প্রবর্তন। লক্ষণ সেন অল্পকালের জন্যে হলেও মহীপালের রাজ্যসীমা প্রায় উদ্ধার করেছিলেন। তবুও দেখা যায়, তিনি বখতিয়ার খিলজীর অল্প সংখ্যক সৈন্যের আক্রমণ থেকে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেন নি। যখন অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে শত্রু সৈন্য অতর্কিতে রাজপ্রসাদ আক্রমণ ও অধিকার করে তখন সাহস ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র লোকবলের অভাবে লক্ষণ সেনকে বাধ্য হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে হয়। লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক

ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের ট্র্যাজেডির মূল নিহিত রয়েছে এবং এর জন্য দায়ী সেন রাজারাই। তাঁরা শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের যোগ্য মর্য্যাদা না দেওয়াতে তারা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছিল, এবং প্রধান হয়ে উঠছিল আমলাতন্ত্র। নানারকম উচ্চপদ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং ছোট ছোট রাজপদে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বিভক্ত হয়েছিল। এদের সঙ্গে প্রজা সাধারণের যোগাযোগ ছিল না। পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধেরা যে সম্মান ও অধিকার পেয়েছিলেন, সেন রাজাদের সময় তারও অমর্যাদা করা হয়েছিল। কারণ সেন রাজারা এবং তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীরা ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার প্রাচারে আগ্রহশীল ছিলেন। বিচার আচার গত গোঁড়ামি প্রধান হয়ে উঠেছিল কিন্তু নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিলাস ব্যসনে এবং নানারকম দুর্নীতি পরায়ণ কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দুর্নীতি যে কতদূর পর্যন্ত সমাজদেহে প্রবেশ লাভ করেছিল তার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্র ধর্মের বিকৃতি এই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্মেরই আচার অনুষ্ঠানকে নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।" সমসাময়িক সাহিত্যে ও পরবর্তী সাহিত্যে এই সমাজের প্রতিচ্ছবিই আমরা লক্ষ্য করি। জয়দেবের গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার-রসের-প্রাধান্য ও 'বিলাস-কলাকুতূহলে'র যে চিত্র পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতার যে অপবাদ, মঙ্গল কাব্যগুলির স্থানে স্থানে রুচিহীন প্রবৃত্তির যে প্রকাশ তার মূল খুঁজে পাওয়া যায় এই সমাজ দেহে। সেন রাজাদের সভায় কবি ও পণ্ডিতদের সমাদর ছিল। বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেন নিজেরাই কবি ছিলেন কিন্তু সেন রাজাদের সময়ে কেবল সংস্কৃতে রচিত সাহিত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়, এই সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। হয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন সেন রাজারা বাংলা সাহিত্য রচনা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, না হয় বাংলা সাহিত্য কিছু রচিত হয়ে থাকলেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। ১২০০—১২০১ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ

আক্রমণে বাংলা দেশের জন-জীবন, সংস্কার ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তারপর প্রায় দুশো বছর ধরে চলে অরাজকতা, অত্যাচার, আতঙ্ক ও অবিশ্বাস।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করে সপ্তগ্রাম রাজধানী স্থাপন করলেও সুলতান ফিরোজ শাহার রাজত্বকালে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পূর্ববঙ্গে ইসলাম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সামাসুদ্দিন ফিরুজ শাহ প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ১৩০২—১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া, মারামারি, বিবাদ চলেছিল কিছুদিন এরপর স্বাধীন নৃপতিরূপে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন ফকরুদ্দিন মেবারক শাহ। বহরমখানের মৃত্যুর পর ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। ফকরুদ্দিন উদার হৃদয় ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র খুব সস্তা ছিল। এই সময়কার আমোদ-প্রমোদের চিত্রে নৃত্যগীত-উৎসব, বাঘের খেলা প্রভৃতির বিবরণ খুবই কৌতূহলজনক।

ঐ থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলাদেশে আবার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ফিরে আসছিল। তবে চীনা পরিব্রাজক মোহানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের সর্বত্রই তিনি মুসলমানদের দেখেছিলেন এবং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই সময়ের নানা বিবরণ থেকে অনুমান হয় যে, এই সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়েছিল; শক্তি, সামর্থ্য, সাহস, সব কিছুরই অভাব ঘটেছিল তাদের জীবনে। এরপর হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ) বাংলাদেশে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছিল এবং সেই সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যে নিদর্শন মেলে; এর পূর্বে নানা গোলমালে বিশৃঙ্খলায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার অনাচারে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় কোনো সাহিত্য রচিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না আর হয়ে থাকলেও তাদের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে

যুগ-প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সাহিত্যও ছিল দেব-নির্ভর, তবে এর একটা বিশিষ্টতা আছে। চর্য্যা গীতিকাগুলিতে আর্য ও আর্যেতর জাতির মধ্যে, অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যে যে প্রচণ্ড ব্যবধান আত্মপ্রকাশ করেছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যে সেই ব্যবধান মুছে ফেলবার চেষ্টাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

উচ্চ-নীচে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে-আর্য, আর্যেতর সংস্কৃতে ও লোক ভয় (অপভ্রংশে) একটা অপ্রতিরোধ্য মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। সব দুর্বলতা, গ্লানি, কলুষতা দূর করে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যুগ-মানসের এই চেতনারই প্রকাশ হয়েছিল ঐ যুগের সাহিত্যে এবং তারই ফলে রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য ইত্যাদি।

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের যুগ। এর মূলে একদিকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব অন্যদিকে হুসেনশাহী রাজত্বের সুশৃঙ্খল পরিবেশ। শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ বাংলাদেশের সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে। সুলতান হুসেন শাহ—কেবলমাত্র শৌর্যবীর্যবান ক্ষমতাশীল নৃপতিই ছিলেন না, সুশাসক এবং বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ বা ছুটী-খাঁ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে শাসন ব্যবস্থায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁরও বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারত রচনা করিয়েছিলেন। হুসেনশাহী বংশ অতি অল্পকালের জন্য ১৫৩২—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে আফগান দলপতি বিহারের জায়গীরদার শের খাঁ বাংলাদেশ অধিকার করেন ও ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনও অধিকার করেছিলেন। বাংলা দেশকে তিনি ছোট ছোট জায়গীরে ভাগ করে আফগান দলপতিদের উপর প্রত্যেক বিভাগের শাসন কর্তৃত্বের ভার অর্পন করেন। এইভাবে বাংলাদেশে ভুঁইয়াদের উৎপত্তি হয়। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর সিংহাসন অধিকার করেন তাজ খাঁ কররাণি। এই বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁ কররাণি টুকারো ১৫৭৬

খৃষ্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বাংলাদেশে মোগলদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ। আফগানরা সর্বত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শাহাবাজ খাঁ পাঠান ভুঁইয়া ঈশা খাঁকে দমন করতে অসমর্থ হন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বাংলায় সুবা-শাসন প্রবর্তন করেন এবং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের দমন করেন এবং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই সময়ে বাংলা দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল।

বাংলা দেশে এই সময়ে পাঠান-শক্তির বিদ্রোহ আর মোগল-শক্তির সেই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশা ও !বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল; অর্থনৈতিক সমস্যাও প্রবল হয়ে উঠেছিল; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে তার চিত্র অঙ্কিত 'হয়েছে। পাঠান রাজত্বের শেষ দিকে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা দেশে বিদেশী পর্তুগীজ বণিকদের যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের শুরু হয়। এর ফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই সময়ে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। কারণ, পাঠান সুলতানেরা বাংলা দেশেই থাকতেন, তাতে দেশের টাকা দেশে থাকতো এবং দেশের লোকের সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের কিছু যোগাযোগও থাকতো। সুলতান হুসেন শাহ হাবসী শাসন থেকে বাংলাকে রক্ষা করে হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যাঁদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশের সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিলেন। মোগল আমলে যাঁরা সুবাদার নিযুক্ত হতেন, তাঁরা মোটা মোটা অঙ্কের টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন; দেশের সঙ্গে তাঁদের কেবল শাসন ও শোষণের সম্পর্কই ছিল। তাঁরা বাঙালীকে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন না, এই কারণে বাংলা দেশের সাধারণ লোকের জীবন তখন খুবই দুর্দশাগ্রস্ত ছিল।

হুসেনশাহী আমলে 'সুলতান শাহ নিজে অত্যাচারী না হলেও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা যে হিন্দুদের উপরে রীতিমত অত্যাচার করত তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুদের ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করবার দিকে তাদের প্রবল ঝোঁক ছিল। হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি এবং মুসলমান রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে অনেক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যে বাধ্য হয়ে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তার নজির পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বর্মন এবং সেন রাজত্বের কালে একদল বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকে আঁকড়িয়ে ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনাধীনে থেকে তাঁরা ভক্তি ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। নীরস পাণ্ডিত্য ও হৃদয়হীন আচার-বিচার তখন হিন্দু ধর্মকে শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করেছিল। নূতন সৃজনীশক্তি ও প্রাণশক্তি হিন্দুধর্মের কিছুমাত্র ছিল না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' লিখে কঠিন নীতিপাশে সমাজকে বাঁধবার চেষ্টা করছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য না থাকলেও গোপনে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম তন্ত্রাচার অনুষ্ঠিত হত। শাক্ত ধর্মেরও প্রাধান্য ছিল দেশে। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর পূজা হত, মদ্য মাংসযোগে যক্ষের পূজা হত এবং 'ব্যবহার রসে' সবাই মগ্ন ছিলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে লিখছেন ঃ

ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন্‌জন।
পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন ॥

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে ॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥

নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥

তান্ত্রিক ধর্মের আবরণে নানারকম অনাচার, অত্যাচার, ব্যাভিচার দেশে চলছিল, তুকৃতাক্ প্রভৃতি অলৌকিক কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ লোকের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দলাদলি, বিদ্বেষ ও হিংসা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সমাজ এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছিল, যখন মানুষের জীবনে প্রবল হৃদয়াবেগ ও অন্তরের স্পর্শেরই প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। শ্রীচৈতন্য উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় জীবনে ও ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে প্রীতি, সহৃদয়তা, ভগবানে ভক্তি এই সবই অত্যাবশ্যক। তাই তিনি যুক্তিতর্কের পথ পরিত্যাগ করে মানুষের হৃদয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। দেশের বিপর্যয়, নৈতিক অবনতি, আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ এবং জাতিতে জাতিতে বিভেদ ইত্যাদি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল জাতির জীবনে একটা ঐক্য, একটা মিলন প্রয়োজন, যা কেবলমাত্র মানুষের আত্মিক চেতনা ও আত্মিক শক্তির দ্বারাই ঘটানো সম্ভব। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব বেছে নিয়েছিলেন প্রেমধর্মের পথ, প্রচার করেছিলেন যে যুক্তি, তর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার, আড়ম্বর নয়, ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে মানুষের আত্মিক মিলন, এবং নীচতা, হীনতা হিংস্রতা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্তি; আর নিজের জীবনে মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর প্রচারিত ধর্ম। তাঁর সমস্ত আচরণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম এবং মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেম কত নিবিড় ও কত গভীর হতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে ঃ

অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেম ভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতাঃ মধ্য-লীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ)

*　*　*　*　*　*

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের যে দুটী যুগের বিষয়ে আলোচনা করা হল, তার থেকে এইটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব অত্যন্ত যুগোপযোগী ঘটনা।

নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল রাজাদের রাজত্বকালে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় লীলামূলক লৌকিক গীত, ছড়া, নাটযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের লোক সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে খুব সম্ভব অপভ্রংশ ভাষার মাধ্যমে। কেননা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা-মূলক কাহিনীর যে পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অপভ্রংশ সাহিত্যের শিল্পরীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যদি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক আদি বাংলাকাব্য বলে ধরা যায়, তবে দেখা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বাংলা হলেও তা সবেমাত্র অপভ্রংশের খোলস ছেড়েছে আর এই কাব্যটি ভাব, ভাষা, শিল্পরীতি সব দিক দিয়ে গীতগোবিন্দের একান্ত অনুসারী।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির 'কান্ত-কোমল পদাবলী' রচিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম প্রচারের কাজ খানিকটা সহজ হয়েছিল।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনার প্রায় তিন শতাব্দী পরে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এইযুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের জীবনে একটা প্রবল হৃদয়াবেগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং যুক্তি, তর্ক, আচার, অনুষ্ঠান, আড়ম্বর সব কিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ওপর ভিত্তি করে নূতন করে বৈষ্ণবধর্মকে 'প্রেমধর্ম' বা 'ভক্তিধর্ম' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ভালোবাসার মাধ্যমে ভগবানের অস্তিত্ব জীবনে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের পক্ষে প্রয়োজন ভগবানের মাধুর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করা; এবং ভগবানের দর্শন লাভের সাধনায় রসমধুর ভাবের পদ্ধতি অবলম্বন করা। এই দুয়ের প্রেরণাই শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে পেয়েছিলেন, তার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি' ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত 'প্রেমধর্ম' প্রচারের উদ্দেশ্যে যে 'মহাজন পদাবলী' রচিত হয়েছিল তার মূল প্রেরণাও জয়দেব, চণ্ডীদাস, এবং বিদ্যাপতির সুমধুর রচনার ভাবমাধুর্য ও গীতি-ঝঙ্কার।

২

সনাতন বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস
ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য

৻থম পরিচ্ছেদের একেবারে শেষের দিকে উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে ৷হাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনায় ভগবৎ প্রেম বা ভক্তির লক্ষণ বলে যেগুলিকে ৷াখ্যা করা হয়েছে, সেইগুলিই প্রকৃত বৈষ্ণবতার লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি ৷শ্লেষণ করলে দেখা যাবে পরার্থে স্বার্থত্যাগ ও সার্বজনীন করুণার ৷পরেই সনাতন বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি এবং এই ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান শ্রীবিষ্ণুর ৷াম কীর্তন।

ত ও পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম

পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ঋক্‌বেদকে বৈষ্ণবধর্মের ৎস বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থের প্রথমেই ৷বষ্ণবধর্ম ও ঋক্‌বেদ' পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন :

"বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ ৷ক্‌বেদ সংহিতা।" প্রমথনাথ ঋক্‌বেদের বিষ্ণুসূক্তগুলি থেকে গোটা চারেক ৷ক্ টীকা ও ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

"এই প্রকারের বহু মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তার ভয়ে ৷হা উদ্ধৃত হইল না। যে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত ৷পরিবর্তণীয় স্বরূপ তাহাতেই সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বজনীন ৷ঙ্গল যাহার দ্বারা হইতে পারে, আমার এমন সুমতি তোমার অনুগ্রহে হোক্। ৷ামার প্রভূত ধন হোক্, সেই ধনের দ্বারা যেন আমি বহুজনের সুখ ৷ম্পাদন করিতে সমর্থ হই। শ্রীবিষ্ণুর নাম দীপ্তিময় ও চৈতন্যস্বরূপ,

সেই নামের মাহাত্ম্য বা অর্থ না জানিয়াও যদি কেহ তাহা উচ্চারণ করে তাহা হইলে সেই নামের প্রতিপাদ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর নাম বা লীলা বহু লোক কর্তৃক একসঙ্গে গীত হয় এবং এইভাবে নাম বা লীলাগান তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রে বৈষ্ণব সাধকোচিত এইপ্রকার যে মনোবৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া সকল বৈষ্ণব সাধনা অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতে আত্মলাভ করিয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত।"

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতের সমর্থনে তাঁর উদ্ধৃত ঋক্‌বেদের বিষ্ণুসূক্তের চারটি ঋক্ অনুবাদ টীকা ও ব্যাখ্যা সহ এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। এই সঙ্গে আরো কয়েকটি ঋক্ উদ্ধৃত করা হল যেগুলির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর মাধুর্যময় রূপের ইঙ্গিত আছে এবং বন্ধুভাবে প্রীতির মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করা যায়, তারও আভাস দেওয়া আছে।

"বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম" গ্রন্থে উদ্ধৃত ঋক্‌বেদের চারিটি ঋক্ :

ঋক্‌বেদ প্রথম মণ্ডল। সূক্ত ১৫৬

বিষ্ণু দেবতা উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি জগতী।

ঋক্-৩।

তমু স্তোতার পূর্ব্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥

'সায়নাচার্য'কৃত ব্যাখ্যানুবাদ : "হে স্তোতৃগণ, তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। তাঁহার নাম সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময়। সেই নামকে সকল প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় জানিয়া তাহারই উচ্চারণ করিতে থাক।

হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।"

এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন :

"হে বিষ্ণো! তব নাম চিৎ—চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্যাং অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্ত! নতু সম্যক উচ্চারমাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবানাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণা। সুমতিং তদ্বিষাং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ।

হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেই হেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ, সেই নামের ঈষৎও মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণ ভাবে না জানিয়াও যদি কেহ উচ্চারণ করে, তবে সেও তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়।" (বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম)।

ঋক্‌বেদ—৭ম মণ্ডল। সূক্ত ১০০

বিষ্ণুদেবতা মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ঋক্-১।

পূ মর্ত্যঃ দয়তে সনিষ্যন্ যঃ বিষ্ণবে উরুগায়ায় দাশত।
প্র যঃ স প্রাচা মনসা জাত এতাবন্তং নর্য্য মা বিবাসাৎ॥

"যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন, সেই মর্ত্যধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র প্রাপ্ত হয়েন।"

ঋক্-২।

ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যাং অপ্রযুতামেবযাবো মতিং দাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্যভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্যরায়ঃ।

"হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত প্রচুর অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়—তাহা কর।"

ঋক্-৩।

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চ সংমহিত্বা।
প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম॥

"এই দেবতা শত সংখ্যক কিরণ বিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবুদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তি যুক্ত।"

ঋক্‌বেদ থেকে উদ্ধৃত অন্যান্য ঋক্ ঃ

প্রথম মণ্ডল। সূক্ত ১৫৪

বিষ্ণুদেবতা উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ।

ঋক্-৫।

তদস্য প্রিয়মপি পাথো অস্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরম মধ্ব উৎসঃ॥

"দেবাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ যে প্রিয়পথ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন, আমি যেন সেই পথ প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু।"

প্রথম মণ্ডল। সূক্ত ১৫৬।

ঋক্-১।

ভব মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ।
অধ তে বিষ্ণো ইতি বিদুষা চিদর্ঘ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা॥

"হে বিষ্ণু। তুমি মিত্রের ন্যায় আমাদের সুখপ্রদ ঘৃতাহুতি ভাজন, প্রভূত অন্নবান রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান যজমান কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উচ্চার্য এবং তোমার যজ্ঞ হবিষ্মান যজমানের আরাধণীয়।"

৭ম মণ্ডল। সূক্ত ১০০।

ঋক্-৫।

প্র তৎ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামাহর্য্যঃ সংশামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তব সমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস রজস্যঃ পরাকে॥

"হে শিপিবিষ্ট, অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করিব।"

তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে ব্যস্ত কর।

ঋক্ সংহিতার উল্লিখিত মন্ত্র কয়েকটিতে বৈষ্ণবতার বিশেষ লক্ষণ বলে যে বিশ্বজনীন প্রীতির ভাব স্পষ্ট সূচিত হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ভাবের চরমোৎকর্ষ দেখা যায়। প্রমাণ হিসাবে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
আর্ত্তীঃ প্রপদ্যেঽখিল দেহ ভাজা
মন্তঃ স্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥

অষ্টবিধ ঐশ্বর্যযুক্ত পরমপদ প্রাপ্তি বা নির্বাণ আমি ঈশ্বরের নিকটে চাই না। আমি চাই, সকল প্রাণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের যত প্রকার আর্তি আছে, আমি যেন তা সকলই নিজ আত্মাতে গ্রহণ করতে পারি এবং তাতে যেন তাদের সকল প্রকার দুঃখ দূর হয়।

ঋক্‌বেদের উল্লিখিত মন্ত্রগুলিতে সংক্ষেপে বৈষ্ণবধর্মের প্রধানতম সাধন-

—নাম কীর্তনের যে ইঙ্গিত আছে, পরবর্তী কালে পুরাণেও তা বিদিত হয়েছে।

স্কন্দপুরাণ :

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম ॥

অগ্নিপুরাণ :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—
রটন্তি হেলয়া বা পি তে কৃতার্থা ন সংশয় ॥

মহাভারতের যুগে বৈষ্ণব ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে 'পাঞ্চরাত্রিক সাত্বত' ধর্ম বা 'ভাগবত' ধর্ম আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রৌতনাম 'বিষ্ণু'র পরিবর্তে উপাস্য দেবতার নাম হয়েছিল 'বাসুদেব কৃষ্ণ'। এবং এই দেবতার স্তুতি ধ্যান ও তাঁর উদ্দেশ্যে জপ, হোম প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই যুগে আগম বা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রচারের সঙ্গে উপাসনা, ধ্যান, দীক্ষা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি নানাবিধ বিধান, এবং তারই সঙ্গে মন্দির নির্মাণ, দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা, জীর্ণোদ্ধার, পূজক ও সেবক বিভাগ প্রভৃতির সাহায্যে বৈষ্ণবধর্ম অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু এই সব পরিবর্তনশীল অঙ্গ বিস্তৃতির যুগেও বৈষ্ণবধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান 'নামকীর্তন' বা মূল ভাব 'সার্বজনীন করুণা', 'বিশ্বজনীন প্রীতি' ইত্যাদির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এই সকল ভাবই বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ হিসাবে যুগে যুগে স্বীকৃত ও আদৃত হয়েছে।

প্রাচীন কালের শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম কখন জ্ঞানমুখী, কখন ভাবমুখী প্রেরণায় বিশ্বজনীন প্রীতির অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। আর এই সার্বজনীন করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রেম ধর্মের ভিত্তি।

বাস্তব জগতে মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সে সুখ চায়, দুঃখ চায় না। মানুষের সমস্ত রকম প্রবৃত্তির মূলে আছে সুখের ইচ্ছা বা রাগ আর দুঃখকে এড়াবার ইচ্ছা বা দুঃখের প্রতি দ্বেষ। কাজেই মানুষের প্রবৃত্তিকে দুভাগে ভাগ করতে হয়—রাগমূলক ও দ্বেষমূলক।

সংসারে মানুষ যে কাজই করুক তার সমস্ত কাজের মূলে আছে এই দুই প্রবৃত্তি, কাজেই এই দুই বৃত্তিকেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিদেরা 'প্রেরণা' বলেছেন। ছান্দগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে আছে, ব্রহ্মবিত্তম সনৎকুমার নারদকে উপদেশ দিচ্ছেন:

"যদা বৈসুখং লভতেঽথ করোতি না সুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" অর্থাৎ মানুষ যদি সুখকে লাভ করতে পারে (এইরূপ বোঝে) তবেই সে, সে কাজে উদ্যত হয়। সুখলাভ করবার আশায়েই মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সর্বাগ্রে সুখ কি, তাই জানতে হবে। তখন নারদ বললেন' "সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে" অর্থাৎ "হে ভগবান! সুখের স্বরূপ কি, তাই আমি জানতে চাই।" নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বললেন:

যো বৈ, ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি,
ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য।

"যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ, নাই; ভূমাই সুখ, সুতরাং ভূমাই জিজ্ঞাস্য।" শ্রুতি নির্দিষ্ট এই ভূমা বা অমৃত লাভের পথ কি, এই জিজ্ঞাসাই ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মূল প্রেরণা। এই জিজ্ঞাসার চারিতার্থতার জন্য যে সাধনা, তাই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নামে প্রথিত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তিহীন কেবলমাত্র কর্মদ্বারা ভূমাকে পাওয়া যায় না। শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা"। অর্থাৎ এই ত্রিতাপ সঙ্কুল ভবপারাপারে যাবার জন্য যজ্ঞ বা বিহিত কর্মরূপ যে প্লব বা ভেলা, তা দৃঢ় নয়। সুতরাং বাকী যা রইল, সেই জ্ঞান ও ভক্তিই স্বতন্ত্রভাবে বা মিশ্রিত

ভাবে ভূমাকে পাবার সাধনা। এই বিভিন্ন অথচ একই লক্ষ্যে প্রধাবিত দুটি ভাবধারার সমন্বয় ঘটাবার প্রচেষ্টাই ভারতের সনাতন বৈষ্ণবধর্ম।

বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থ

জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী, এই দুই প্রেরণার সমন্বয় বিধানের জন্য ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মধ্যে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা গ্রন্থ দুখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর্বপ্রধান ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভক্তির সাহায্যে অনির্বচণীয় ভগবৎ প্রেম হৃদয়ে উপলব্ধি করতে মানুষ সমর্থ হয়, এইভাব ভগবদ্‌গীতায় নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহয্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সকল বস্তুতে শ্রীভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করে তারই সেবারূপ বিশ্বজনীন প্রেম শ্রুতি থেকে আরম্ভ করে উপনিষৎ, আগমশাস্ত্র ও পুরাণে কোথাও অল্প-বিস্তর ইঙ্গিতে কোথায় বা ব্যক্তিভাবে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম রূপে অভিহিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত স্বরূপই এই, তবু বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও প্রসার ভালোভাবে বুঝতে হলে দ্রাবিড় দেশে তামিল ভাষায় রচিত 'দ্রাবিড়াম্নায়' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থনিবহ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্ম

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্দের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রাবিড় দেশে বৈষ্ণব ভক্তগণের আধিক্য বর্ণিত হয়েছে। আচার্য রামানুজ দক্ষিণ দেশে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি কোন জায়গায় ভাগবতের কোন বচন উদ্ধৃত করেন নি। তিনি পঞ্চরস প্রবণ বৈষ্ণবোপাসনা মার্গের কোন ইঙ্গিতও দেন নি। বিষ্ণুপুরাণের বহু বচন তিনি প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন। বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিষ্ণুপুরাণের বচন সমষ্টির উপর বেশী নির্ভর করে। রামানুজের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ হাজার বৎসর আগে দ্রাবিড় দেশে তামিল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহে 'আলবার' নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্‌বার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই তামিল ভাষায় রচিত। চতুর্ভুজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বামে শ্রীলক্ষ্মীদেবী এঁদের উপাস্য বিগ্রহ।

আল্‌বার সম্প্রদায়ের বারো জন আচার্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শঠারি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সর্বস্বামী শ্রীভগবানই পুরুষোত্তম এবং সেই পুরুষোত্তমেই কেবল পুরুষত্ব আছে। শ্রীভগবানের শরীর ও গুণরাশি স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষগণেরও মনকে অনুরক্ত করে। শঠারি সম্বন্ধে এইরকম শোনা যায় যে, পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেবকে কান্তভাবে আরাধনা করতে করতে তাঁর শরীরে নারীলক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। অভিরাম বরাচার্য্য রচিত 'দ্রাবিড়োপনিষৎ তাৎপর্যম্' গ্রন্থে শঠারির কামিনীভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

রামানুজ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেদান্ত দেশিকাচার্য 'তাৎপর্য রত্নাবলী' নামে সংস্কৃত গ্রন্থে সপ্তদশ শ্লোকে শঠারি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করেছেন: "(সেই শঠারি) ব্রজযুবতীগণের প্রখ্যাত নীতি (উপাসনা) অবলম্বন করে শ্রীভগবানকে ভোগ করেছিলেন।" বেদান্ত দেশিকাচার্য আরো বলেছেন: "ভগবানের আকার সুঘটিত সুতরাং প্রিয়। তাঁর মূর্তি সমুন্নত ও দীপ্তিময়। প্রীতির উন্মেষ হলে তাঁকে ভোগ করতে পারা যায়। তিনি নবোদিত জলদের ন্যায় কমনীয়। তাঁর অঙ্গে নানাপ্রকার ভূষণাদি আছে বলে তিনি বড়ই বিস্ময়াবহ। তাঁর প্রীতি ও শীল ভুবনে প্রখ্যাত। তিনি রসস্বরূপ, অথচ সে রসের স্বরূপ কি, বাক্যের অগোচর।" (বাংলার বৈষ্ণবধর্ম)।

স্ব প্রাপ্যাসিদ্ধকান্তিং সুঘটিতদয়িতং বিস্ফুরদুত্তুঙ্গমূর্ত্তিম্
প্রীত্যুন্মেষাদিভোগ্যং নবঘনসুরসং নৈকভূষাদিচিত্রম্
প্রখ্যাতপ্রীতিশীলং দুরভিলপরসংসদগুণামোদহৃদ্যম্
বিশ্বব্যাবৃত্তিচিত্রং ব্রজযুবতিগণখ্যাতনীত্যাঽন্বভুংক্ত।

'গোপী' ভাব

এই শ্লোকে যে নারীভাবের বর্ণনা করা হয়েছে তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'গোপী'ভাব। পরমজ্ঞানী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল গোপ রমণীদের নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাবার জন্য। ব্রজগোপীগণ বৈরাগ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি জনিত নিদারুণ মর্ম-যন্ত্রণা উপশমিত হবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। উদ্ধব ব্রজললনাদের উত্তর পেলেন ঃ

বৈরাগ যোগ কঠিন উধো! হাম না করব হো।
ক্যায়সে ত্যজব এ্যায়সা দেশ, জটামটুক করব ভেশ ;
অংবভূত লায়ে জহর, খাযে মরব হো।

অর্থাৎ "ওহে উদ্ধব"! বৈরাগ্য যোগ অত্যন্ত কঠিন, ও আমরা পারব না। এই ব্রজভূমি, কৃষ্ণপ্রেমের এই দেশ, ত্যাগ করতে পারব না। জটা বল্কল পরতেও পারব না। তার চেয়ে বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করব।" উদ্ধব ব্রজগোপীদের প্রেমে এমনই মুগ্ধ হলেন যে তাঁদের লক্ষ করে বললেন ঃ

আসামহং চরণরেনুজুষামহোস্যাম
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতোষধীনাম্।

অর্থাৎ "মরণের পর আবার যদি এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়, তা হলে ব্রজলালনাগণের চরণের রেণু যাদের উপর পতিত হয় এমন কোন গুল্মলতা বা ধান বা যব প্রভৃতি ওষধির মতো আমি যেন জন্ম লাভ করি।"

মধুর রসের সাধনা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দী থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিল। তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রতিপাদিত গোপীভাব বৈষ্ণব সাধনা রামানুজ ও মাধব কর্তৃক প্রচারিত হয় নি। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মধুর রসের সাধনা কিছু পরিমাণে আদৃত হলেও সাধন পদ্ধতি হিসাবে এর শ্রেষ্ঠত্ব ষোড়শ শতাব্দীর আগে স্বীকৃত হয়েছিল কিনা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া

যায় নি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে মধুররস-প্রধান বৈষ্ণব সাধনার পরিচয় জয়দেব, বিদ্যাপতি এঁদের কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চতুর্বিধ ভক্তিরসের পরিচয় নেই, শুধুমাত্র মধুর রসের উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। রাধাতন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, বিষ্ণুযামল প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু এদের ওপর ভিত্তি করে কোন সাধন প্রণালী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল কিনা তার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বা বিশিষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের উৎপত্তি

একথা সর্বজনবিদিত যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কোন গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ করেন নি। এসম্পর্কে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিমত :

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার লীলাচরিতই অগ্রে অনুশীলনীয়, অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্যগণের মত তিনি স্বসিদ্ধান্ত-প্রকাশক কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। প্রবাদ আছে, তিনি মাত্র কয়েকটি শ্লোক (৮টি মাত্র) সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।" (বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম)। প্রমথনাথের অভিমতের সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গোটাকয়েক শ্লোক উদ্ধৃত করা যায় :

প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কৈল অবতার।

(শ্রীচৈঃ চঃ আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এইসব মর্ম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ)।

প্রেম ভক্তি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর ,আচরণ বা ভক্তগণের সঙ্গে তাঁর লীলা এবং তাঁর নিজ জীবনে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের রচনায় পাওয়া যায় । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টক' শ্লোক আস্বাদনের বর্ণনা আছে ঃ

সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুইবন্ধু লঞা ॥

শ্রীমুখ নিসৃত শ্রীশিক্ষাষ্টক (বা শ্রীভাগবত-নির্যাস) ; নামাভ্যাস ও নামের ফল ঃ

১) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—
চেতোদর্পণ মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন ।
চিত্ত, শুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥

উঠিল বিষাদ, দৈন্য,—পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ শোক॥

২) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—
নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশ মহাজনিনানুরাগঃ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ
অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক—নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ নিয়ম নাহি, সর্ব সিদ্ধি হয়॥
"সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥"
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন, স্বরূপ রামরায়॥

৩) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা ।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥

৪) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা :
ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতাসুন্দরী ।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি ।

৫) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা :
তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥

৬) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া, বদনং গদ্গদ্-রুদ্ধয়াগিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

৭) তথাহি পদ্যাবল্যাম—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল যুগ সম ।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

৮) তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ঃ

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কায অপর ধনে ॥

এই আটটি শ্লোক রচনা ভিন্ন মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে অনেক দার্শনিক আলোচনাও করেছিলেন। এই সব আলোচনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সব আলোচনার সারমর্ম বর্ণনা করেই শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্ত শিষ্যেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন।

এই সব আলোচনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু যে সব তর্ক বিচারের সাহায্যে স্বীয় ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেগুলিরও উল্লেখ করতে হবে।

আলোচনাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

১) মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধনতত্ত্বের আলোচনা।

২) মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে অভিধেয়তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি।

৩) মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেম ; পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি, গূঢ় ভাগবত সিদ্ধান্ত।

৪) অন্ত্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ মহাপ্রভুর স্বরচিত ৮টি শ্লোক আস্বাদনের বর্ণনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে কাশীবাসী বৈদান্তিক মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহাপ্রভুর তর্কবিচার বর্ণিত আছে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর নিকটে তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু মায়াবাদ খণ্ডন করে, স্বীয় ধর্ম মত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় 'প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনী' শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

"কাশীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্তৃক শঙ্কর-বেদান্তে মহাপণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেহ কোনও প্রশ্ন

করিয়াছেন বলিয়া জানি না।” পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থে লিখেছেন :

“কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ স্বামী অদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরমভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরিপূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।”

শ্রীজীব গোস্বামী ‘ষট্‌সন্দর্ভ’ গ্রন্থে রচনা করে শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত ‘অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব’ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবক, কিন্তু মায়াধীন হওয়ায় তার আত্মবিস্মরণ ঘটেছে। মায়ার অধীন জীব মায়াধীন শ্রীভগবান থেকে পৃথক কিন্তু ভগবানই যখন স্বরূপতঃ অবিকৃত থেকে জীবরূপে পরিণত হ’য়েছেন তখন, জীব ভগবান থেকে অভিন্নও বটেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যবাণী ও চরিত্র অবলম্বন করে শ্রীজীব গোস্বামী ‘ষট্‌সন্দর্ভ’ গ্রন্থে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন, তাই ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন’ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে ‘অচিন্ত্যভেদাভেদ’ সম্বন্ধ শক্তিমানের ও শক্তির সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ, সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি। জগৎ ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম, সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি। জীব ও জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি, সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ শক্তিমান ও শক্তির সম্বন্ধের ন্যায়। শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধটি ঠিক কি রূপ, তা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা বিচার করে শ্রীজীব দেখিয়েছেন যে, শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে অভেদ

স্বীকার করলেও সমস্যার সমাধান হয় না, আবার শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ স্বীকার করলেও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রকৃতপক্ষে শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ ও অভেদ একই সঙ্গে বর্তমান। আগুন ও আগুণের দাহিকা শক্তির মধ্যে ভেদ নাই, যেখানে আগুণ সেইখানেই তার দাহিকা শক্তি, একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার আগুণের বাইরে তার তাপ অনুভব করা যায় এও অস্বীকার করা যায় না। ভেদ ও অভেদ স্বীকার করাও যায় না অথচ তার হেতুও নির্ণয় করা যায় না। যা অস্বীকার করা যায় না, অথচ যার হেতুও নির্ণয় করা যায় না তাকেই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বস্তু বলা হয়।

> স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদ ; ভিন্নত্বেন
> চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি
> শক্তি শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্তৌ।
> (সর্বসম্বাদিনী ॥ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ৩৬-৩৭ পৃঃ)

অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াও 'যে শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্নরূপে অবস্থান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' গ্রন্থে (ভূ—১৪১ পৃঃ) 'অচিন্ত্য' কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ 'Inexplicable' 'অনির্দেয়'। ইহার অর্থ 'Unthinkable' নয় ; 'Unthinkable' অর্থে অসম্ভাব্যতা সূচিত হয় ; শশশৃঙ্গ বা আকাশ কুসুমের অস্তিত্ব ইত্যাদি Unthinkable কিন্তু মিশ্রির মিষ্টত্ব Unthinkable নহে ইহা হইতেছে Inexplicable, অচিন্ত্য, অনির্দেয়।

হ্লাদিনী ব্যাখ্যা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমভক্তিই জীবের চরমপুরুষার্থ রূপে অঙ্গীকৃত হয়েছে, এবং সেই প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের অন্যতম স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীরই সর্বোৎকৃষ্ট পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে :

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ
হ্লাদতাপকরী মিশ্রাত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

অর্থাৎ "(হে ভগবান !) তুমি যেহেতু সকলের আশ্রয় এই কারণে তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটি শক্তিও আছে। এই তিনটি শক্তিও বাস্তবপক্ষে এক, জীবসমূহে যে হ্লাদকারী, তাপকরী এবং মিশ্রা, এই ত্রিবিধ শক্তি আছে, তাহা তোমাতে নাই।"

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভগবানের এই ত্রিবিধ স্বরূপ শক্তির ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

"সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ, সা সর্বদেশকালদ্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরীসন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি—যয়া সম্বিদুৎকর্ষসাররূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনী ইতি বিবেচনীয়ম্।"

অর্থাৎ "ভগবান যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও অপর বস্তু সকলকেও ধারণ করান, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। সেই প্রকারে ভগবান স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের আশ্রয় হয়েন, এবং জীবসমূহকেও জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম সম্বিৎ। এইরূপ ভগবান স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইয়াও সম্বিৎ শক্তির উৎকর্ষের সার স্বরূপ যে শক্তির দ্বারা সেই স্বরূপভূত আনন্দ স্বয়ং অনুভব করেন, এবং অপর জীব সকলকেও অনুভব করান, সেই শক্তির নাম 'হ্লাদিনী।' এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ক্রমে সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী উৎকৃষ্ট ইহাই বুঝিতে হইবে।"

শ্রীভগবানের ত্রিবিধা স্বরূপ শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীর উৎকর্ষ শ্রুতিতেও স্বীকৃত হ'য়েছে। উপনিষদে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হ'য়েছে : "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ॥" অর্থাৎ "আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া

জানিয়াছিলেন", "আনন্দ হইতেই এই প্রাণী নিচয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, জন্মিয়া সেই আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে, আবার প্রয়াণ কালে সেই আনন্দেই মিশিয়া যায়।" শ্রুতির এই নির্দেশানুসারে আনন্দরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু।

ভক্তিশাস্ত্রের আচার্যগণের মতে শ্রীভগবানের ত্রিবিধা স্বরূপ শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই মানুষের হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়ক রতিকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং ভগবদ্রূপ রস আস্বাদন করায়। ভক্তিশাস্ত্র মতে শ্রীভগবানই আনন্দ। আনন্দরূপ নিজ আত্মাকে আস্বাদন করার এবং জীবমাত্রকে আস্বাদন করাবার শক্তি হ্লাদিনী শ্রীভগবানের স্বরূপভূত হয়ে সর্বদা বিরাজমান। কাজেই ভগবদ্বিষয়ক রতি বা অনুরাগ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী জন্মের পর মানুষের প্রথম চৈতন্য উন্মেষের সঙ্গেই অন্তঃকরণে সমুদিত হয় এবং মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সকল সময়ে কখন স্ফুটভাবে, কখন অস্ফুটভাবে মানুষের হৃদয় অধিকার করে বসে থাকে। অতৃপ্ত সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবধর্ম—কোন মানুষই একে অতিক্রম করতে পারে না। ভক্তিশাস্ত্রের মতে মানুষের এই স্বাভাবিক, সহজ, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত সুখভোগে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না। প্রকৃত রসের আস্বাদনে মানব আত্মা ভোগতৃষ্ণা থেকে বিরতি লাভও করতে পারে না। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর প্রভাবে মানুষ যদি অন্তরের নিত্যসিদ্ধ আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারে, এবং শ্রীভগবানের আনন্দঘন মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, তা হলেই সে যথার্থ মুক্তির স্বাদ পায়। মায়াশক্তির প্রভাবে পড়ে জীব আত্মস্বরূপ ভুলে যায়, তার অন্তর্দৃষ্টি বহির্মুখী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়; এই মায়ার রাজ্য থেকে হ্লাদিনী শক্তিই মানুষকে বের করে আনতে পারে এবং ভগবৎস্বরূপ আনন্দ আস্বাদন করিয়ে চরিতার্থ করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

কৃষ্ণকে আহ্লাদে—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

(চৈঃ চঃ ২।৮।১২০-১২১)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর ভক্ত শিষ্যদের সমস্ত দার্শনিক আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মত যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার সারমর্ম সংক্ষেপে এই :

শ্রীভগবানের ত্রিবিধা স্বরূপ শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীর ঔৎকর্ষ স্বীকৃতির উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি বলেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এর মধ্যে শ্রীভগবানের মাধুর্যের সংবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসত্ব বলে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম—তন্ময়তা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা শ্রুতি নির্দিষ্ট পঞ্চবিধামুক্তি—সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, স্বারূপ্য ও সামীপ্য কোনটিকেই পরমপুরুষার্থতা বা সম্যক্ মুক্তিলাভের উপায় বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পঞ্চবিধা মুক্তির কোন একটি পথ অবলম্বন করে যাঁরা সাধনা করেন, তাঁদের মুক্তিলাভের বাসনাস্বরূপ একটী স্বকীয় কামনা থাকে। এ কামনা তাঁর একান্ত নিজস্ব, অর্থাৎ তাঁর নিজ আত্মার উন্নতি বিধানের কামনা, একে স্বার্থশূন্য বলা যায় না। অপরপক্ষে 'কৃষ্ণদাসত্ব' বল গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রিয়, তাই জীবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, কারণ প্রিয়ত্ব ভাবটি পারস্পরিক। এইজন্যই শ্রীভগবান ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু। জীবের মধ্যে যে সুখবাসনা আছে, তা সাংসারিক

সুখভোগ বা ইন্দ্রিয়জ বাসনা পরিতৃপ্তিতে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না, আনন্দময় রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হৃদয়ে লাভ করতে পারলেই মানুষ যথার্থ আনন্দী হতে পারে। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে: "রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসেবামাত্রই মমত্ববুদ্ধিময়, তবু এদের মধ্যে প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে তারতম্য আছে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাবের উৎকর্ষ। মধুর ভাবের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা পরমপুরুষার্থতা লাভের একমাত্র পথ বলে নির্দেশ করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মোক্ষতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধনতত্ত্বেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের মতে যাঁরা ভক্তিকে বাদ দিয়ে কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ইত্যাদি পথ অবলম্বন করে মোক্ষ লাভ করতে প্রয়াস পান, তাঁরা স্বীয় শক্তিতে মায়ার আবরণ ভেদ করতে প্রয়াস করেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন মানুষের এই প্রয়াস সফল হওয়া সম্ভব নয়। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের মতে মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া। ভক্তির সঙ্গে ভজনা করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে তন্ময় আত্মসমর্পণ করতে পারলে, তবেই মায়ামুক্ত হওয়া যায়। এই শুদ্ধা ভক্তিতে জ্ঞানাদির জন্য উৎকণ্ঠা থাকে না, কেবলমাত্র কৃষ্ণ প্রেমসেবার বাসনা থাকে। শুদ্ধাভক্তির সাধনার নয়টি অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এদের মধ্যে নাম-সংকীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া হয়, কেননা নাম এবং নামী অভিন্ন। অন্য কোন সাধন অঙ্গ ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের মধ্যে ভক্তি দ্বিবিধ—'বৈধী' এবং 'রাগানুগা'। শাস্ত্রের সমস্ত অনুশাসন ও বিধিকে অনুসরণ করে যে ভগবৎ-সাধনা তা হল 'বৈধী' এবং কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করবার জন্য ও শ্রীভগবানের শরণাগতির জন্য যে নিঃস্বার্থ ও আত্মচিন্তা বিলুপ্ত সাধনা তা হল 'রাগানুগা'। শুদ্ধাভক্তি সাধনার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তারপর প্রেমের উদ্ভব। কিন্তু

চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই পূর্ণতমরূপে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। স্তর পর্যায়ে সে প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেমাবির্ভাবের প্রথম স্তরকে, 'রতি' নাম দেওয়া হয়েছে এবং পর পর স্তরগুলির নাম হচ্ছে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ, প্রণয়, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব।

মহাভাবের দুইটি স্তর—মোদন এবং মাদন। মাদনই প্রেমের গাঢ়তম স্তর বলে নির্দেশিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধনতত্ত্বে প্রেম ভাব ও রতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও তিনটি শব্দেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বোঝায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার রসতত্ত্বে।

উপনিষদে ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"ব্রহ্মই পরম আস্বাদ্যতম রস এবং পরম রস আস্বাদকও।" এই রসস্বরূপ পরমব্রহ্মই "শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানন্দ' তিনিই আনন্দঘন, রসঘন এবং মাধুর্যঘন বিগ্রহ।" এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥
(চৈঃ চঃ ২।৮।১১৪)

আবার তিনি

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥
নানাভক্তে রসামৃত নানা মত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তি ধর।
অতএব আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্ত হর ॥

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলেই কৃষ্ণরতি আনন্দ স্বরূপ এবং আস্বাদ্য। তবু বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যাভিচারীভাবের সঙ্গে মিলিত হলে কৃষ্ণরতি 'রসে' পরিণত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্বে বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন;

আলম্বন দুই প্রকার—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন, কারণ তিনিই কৃষ্ণ রতির বা ভক্তির বিষয় আর ভক্তগণ হচ্ছেন আশ্রয়ালম্বন, কেননা ভক্তের মধ্যেই ভক্তি বা রতি থাকে। যার দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে, যেমন ময়ূর পুচ্ছ, কেননা ময়ূর পুচ্ছ দেখলেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি জাগে। যে সমস্ত বহির্লক্ষণ দ্বারা চিত্তে রতির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাদের বলে অনুভাব—যেমন দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, নৃত্য-গীত ইত্যাদি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি চিত্তে আবির্ভূত হলে আটটি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। এই আটটি সাত্ত্বিকভাব—অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ ও প্রলয় (মূর্ছা)।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজনিত নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ভাবকে ব্যাভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণরতির গাঢ়তা অনুসারে সাত্ত্বিকভাব ও সঞ্চারীভাবের অভিব্যক্তিতে তারতম্য ঘটে।

বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁরা পূর্বরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মেলন—এইভাবে প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে স্তর নির্দেশ করেছেন। চৈতন্যপূর্ব কবিদের কাব্যে এই পর্যায়ক্রম দেখা যায় না। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, ভগবদ্ভক্তির গাঢ়তা অনুসারে এই স্তরগুলি কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্বরাগের পদে প্রথম শ্রীভগবানের নাম জপের সংকেত :

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো।
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

অভিসারের পদে সাধন পথের দুরূহতার সংকেত :

একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিষয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন্ পুর॥

ভগবানের সঙ্গে মিলনের আনন্দের অনুভূতিতে ভক্ত মনে যে অহঙ্কার জাগে তা 'সাত্ত্বিক অহঙ্কার' :

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিলা ধনি রাই।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ' কথা তো কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ' ঘর মন্দির গো
তাতে রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানো হ'য়েছে তায়
তাতে শ্যাম চাঁদ ঘুমায়্যা র'য়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে ?
এ' বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ফলে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে—সেই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ও ভক্তের অভিমানের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে 'মাথুরে'র পদে :

পিয়া গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীর মালা॥

কি কহসি, কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥
যত ছিল মনোরথ সব ভেল বাদ।
পরিহরি গেল বন্ধু বিনি অপরাধ॥
হাম নারী অভাগিনী বিহি ভেল বাম।
পিয়া গেও মধুপুর না পূরল কাম॥
গোবিন্দদাস কহই ধনি রাই।
ধৈরয ধরহ—আওব কানাই॥

ভক্ত যত কঠিন সাধনাই করুক, ভগবানের সঙ্গে মিলনের আনন্দের উপলব্ধি তার যতই গভীর হোক্, তবু ভগবান কোন ভক্তেরই নিজস্ব সম্পদ নন, তিনি সমগ্র জগতের আশ্রয়। সকলেই তাঁর শরণাগত কাজেই তিনি বহু-বল্লভ। কাজেই ভক্তের মনে, মান-অভিমানের পরে জাগে অনুশোচনা।

'কলহান্তরিতার' পদে সেই অনুশোচনার প্রকাশ:

আকুল প্রেম পহিল ন জানলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥

স্বরচিত নিয়ম-শৃঙ্খলে ভগবান আপনি বাঁধা। তাঁর নিজ সৃষ্ট অমোঘ বিধানের কঠিনতায় মাঝে মাঝে ভক্তের জীবনে ক্লেশ আসে, দুঃখ আসে, আসে

বিপদ, আসে দৈব দুর্বিপাক, নানা ভয়, নানা দুশ্চিন্তা, নানা দুঃখ, যন্ত্রণায় কাতর ভক্ত মন আকুল, বিভ্রান্ত হয় হতাশায়—ভগবান্ বুঝি তাকে ত্যাগ করেছেন, সেই আর্তির প্রকাশও রয়েছে মানুষের পদে :

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ-গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা।
হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা
গোবিন্দদাস দুখ দাতা॥

ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদের নিদারুণ যন্ত্রণা ভক্তের সহনসীমা অতিক্রম করে, প্রাণ ধারণের শক্তিও তার শেষ হয়ে যায়।

শ্রীরাধিকার বিরহাবস্থা বর্ণনা করে সখি কৃষ্ণকে বলছেন :

শকতি খীন অতি উঠইন পারই
কাতরে সখিমুখ চাই।
পরশি ললাট করে মুখ ঝাঁপল
পদুমিনি হিমকর ধাই॥
মাধব ! করুণা কি লব তোহে নাই।
একবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥

রাই উপেখি ধরণি পর লুঠই কত কত সারঙ্গনয়নী ।
মধুপুরপথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি ॥
এত দিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস বহই উধ মন্দ ।
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত ॥

ভগবান ভক্তের প্রেমের কাঙাল । তিনি কি চিরকালের জন্য ভক্তকে ত্যাগ করতে পারেন ? ভক্তের বেদনা কি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন ? সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা, সমস্ত সঙ্কটের পারে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের চিরমিলন :

রাইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা ।
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা ॥
বিছুরল চরণ রণিত মণি মঞ্জীর
বিছুরল মুরলীক রন্ধ্রে ।
বিছুরল বেশ ভূষণ ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখি পুচ্ছচন্দ্রে ॥
মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত
যামিনী বহে অতি পুঞ্জে ।
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিন মিলল কুঞ্জে ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ ।
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধরে বিধুবর ঝাঁপ ॥

এর পরই বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বোত্তম রসের বিকাশ দেখা যায় মহাভাবের স্বরূপ প্রকাশে ঃ

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত ।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥
এ' সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ ॥
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত ।
মঝু অঙ্গ হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরধই জলধর শ্যাম ।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু গৌরি ॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গৌরি ।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

এই পদের প্রকৃত অর্থ হল এই যে, রাধা প্রথমে মনে করেছিলেন যে বিরহের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায় বেঁচে থাকা ভালো, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যদি মাটীর সঙ্গে, জলের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে মিশে থেকে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপভোগ করতে পায় তবে বাঁচার চেয়ে তাঁর মরণই অধিকতর কাম্য ।

এই যে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার আত্ম-বিলুপ্তির সাধনা, এরই মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে । এই জন্যই বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে ।

৩

বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন স্তরানুযায়ী সমালোচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম একদিন ভগবৎ প্রেমের প্রবল বন্যায় বাংলাদেশের জনসাধারণকে ভাসিয়ে দিয়েছিল ; তার মূলে একদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপরদিকে তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট নূতন রূপ।

শ্রীভগবানের রসস্বরূপত্বের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর আনন্দঘন মূর্তির ব্যাখ্যা করে শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা 'করেছিলেন ভগবান অনন্ত শক্তিময় কিন্তু তিনি অনন্ত প্রেমময়। তিনি ভক্তহৃদয়ের প্রেমের ভিখারী। পাপী যদি ভক্তিভরে তাঁর নাম নেয়, অমনি তার পাপ তাপ দূরে যায়, চিত্তের সমস্ত কুভাব অন্তর্হিত হয়ে শুদ্ধ প্রেমের জ্যোতিতে তার অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পতিত ও দুর্গত মানবাত্মার তিনিই একমাত্র ও পরমাশ্রয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে মহাপ্রভু আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, ভগবানের মাধুর্যের তুলনা নাই এবং এই মাধুর্যের এমনি আকর্ষণ যে ভগবানের চিত্তেও স্বমাধুর্য আস্বাদনের বাসনা উদয় হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতকার কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দুটি প্রধান গুণকে তাঁর লীলা প্রকটনের হেতু নির্দেশ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রসিক শেখর এবং পরম করুণ। রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রস বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য অপ্রকট ব্রজলীলায় নানাভাবে তাঁর পরিকরদিগের প্রেমরস আস্বাদন করেন, কিন্তু তাতে তাঁর রসাস্বাদনের বাসনার তৃপ্তি হয়না ; স্বমাধুর্য

আস্বাদনের জন্য তাঁর বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এই বাসনার সঙ্গে আরো দুটী বাসনা তাঁর চিত্তে জাগে যে প্রেম দিয়ে শ্রীরাধা তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই প্রেম বস্তুটী কি রূপ, তার মহিমা এবং এই প্রেম রাধা চিত্তে যে সুখোৎপত্তি করে সেই সুখই বা কি রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটী বাসনা ব্রজে অপূর্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনের বাসনা পূরণের উপায় সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের ভূমিকায় 'শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

"স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জন্মিয়াছে সেই বাসনা পূরণের একমাত্র উপায় মাদনাখ্য মহাভাব— ব্রজে শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূরণের জন্য এবং তাহার ব্যপাদেশে সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, দিয়া স্বীয় রাধিকা নাম সার্থক করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রসিক শেখরত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। তাই তিনি তাঁহার মাদনাখ্য ভাব শক্তিমান কৃষ্ণকে দিতে পারিলেন এবং কৃষ্ণ ও তাহা নিতে পারিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তাহার এবং পরিবারর্গেরও বিগ্রহ ভাবেরই বিগ্রহ তাঁহাদের ভাব এবং বিগ্রহে পার্থক্য কিছুই নাই—উভয়ই শুদ্ধ স্বত্ত্বের বিলাস। উভয়ই অভিচ্ছেদ্য, ভাব সম্মিলিত। তাই শ্রীরাধার ভাব দিতে হইলে তাঁহার বিগ্রহও শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয়। শ্রীরাধা উভয়ই দিলেন শ্রীকৃষ্ণও নিলেন। শ্রীরাধা স্বীয় প্রতি অঙ্গ দ্বারা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌর সুন্দর করিলেন এবং স্বীয় চিত্তদ্বারা শ্যামসুন্দরের চিত্তকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় প্রীতি রসে শ্যামসুন্দরের চিত্তকে সম্যক রূপে পরিসিঞ্চিত, পরিনিষিক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভাবরূপা রাধা করিয়া দিলেন। এইরূপে দেখা গেল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় স্বরূপত্বের প্রাধান্য। এই রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রকটনের যে হেতু নির্দেশ করেছেন সে অনুসারে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্ত রসাস্বাদনের বাসনা

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গলীলায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। নবদ্বীপলীলার এই বিশেষ তাৎপর্যের জন্য যে কবিগোষ্ঠী এই লীলা প্রত্যক্ষ করে এই বিষয়ে পদ রচনা করেছিলেন তাঁদের পদের মূল্য নিরতিশয় অধিক। যে কবি-গোষ্ঠী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নবদ্বীপলীলা বিষয়ে পদ রচনা করেছিলেন তাঁদের অনেকের পদে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাভাব ও কৃষ্ণভাবাবিষ্ট মূর্তির যথাযথ বর্ণনাই শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়স্বরূপত্বের প্রধান ব্যাখ্যা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশের তাৎপর্যই প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মসাধনার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রভুর নদীয়া বিহারকালীন অনুচরগণের পদে তাঁর রূপ ও ভাবাবেশের অতি খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের নদীয়ালীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের পদ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তাঁদের রচিত পদাবলীর প্রায় সবই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ কেউ কেউ দু-একটি রচনা করেছেন, কিন্তু সংখ্যার তুলনা হিসাবে তাদের স্থান দেওয়া চলে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয় জন প্রতিষ্ঠিত কবির রচনায় দেখা যায়:

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের ৩৩টি পদের মধ্যে মাত্র দুইটী শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক—"কিনা হইল সই মোরে কানুর পীরিতি.........." ইত্যাদি এবং "রাইক বিপত্তি শুনি, বিদগধ শিরোমণি......... .." ইত্যাদি।

বাসুদেব ঘোষের ৮৮টি পদ, গোবিন্দ ঘোষের ৯টি পদ, শিবানন্দ সেনের ৫টি পদ এবং মুরারি গুপ্তের ৯টি পদ, সবই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক। মাধব ঘোষের ৭টি পদের ৩টি এবং রামানন্দ বসুর ২০টি পদের মধ্যে ৪টি শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। বংশীবদন দাসের পদাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের সংখ্যা বেশী। তাঁর রচিত ৪২টি পদের মধ্যে মাত্র ৬টি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক।

শ্রীচৈতন্যের পরিষদবর্গ ও ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে উপাসনা করেছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ পদকর্তাদিগের অনুভূতি অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যভাবের অবতার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ অথবা শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উপলব্ধি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। বৃন্দাবন যখন তাঁর মনে পড়ে, শ্রীরাধিকার জন্য তখন তিনি ব্যাকুল হন; ভক্ত গদাধরকে দেখে সান্ত্বনা পান। নরহরি সরকারের কৃষ্ণাবতার ভাবের পদগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি পদ আছে, যেগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকার অন্তরের গভীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর কারণ এই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণাবতার ভাবের প্রকৃত যে ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেম একদিকে নিজে অনুভব করবার জন্যে ও অপরদিকে সেই প্রেম সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরদেহে শ্রীচৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নীচে নরহরি সরকার ঠাকুরের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হল, যা থেকে তাঁর রচিত পদগুলির অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে:

রসে তনু ঢরঢর গৌর কিশোরবর
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তর ব্যথা
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাথী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গতনু
অদ্ভুত গৌরাঙ্গলীলা।
রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলাসিতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥

কহিবার কথা নয়,   কহিলে কি জানি হয়
        না কহিলে মনে বড় তাপ ।
মনে অনুমান করি   গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
        নরহরি করয়ে বিলাপ ॥

২)   কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে ।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে ॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি ।
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি ॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ ।
মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥
রাধা ভাবে গদাধর কি জানি কি কহে ।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে ।
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে ।
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে ॥

৩)   পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গসুন্দর বসিয়া বিরস মনে ।
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর বাসক সজ্জার ভাণে ॥
কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া শেজ সাজাইনু ফুলে ।
গতপ্রায় নিশি কোথা কাল শশী রজনী গেলা বিফলে ॥
না আসিল কালা আর প্রেম জ্বালা কত না সহিব প্রাণে
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পীরিতি সে শ্যাম নিঠুর সনে ॥
হেম দরপনি গৌরাঙ্গ লাবণি ধূলায় ধূসর কাঁতি ।
আসন বসন ত্যজিয়া রোদন ব্রজবিলাসিনী ভাতি ॥
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি ধরণী ধরিয়া উঠে ।
কোথা না যাইব, কাহারে কহিব পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥
সহচরগণে করিয়া রোদনে কহয়ে বদন তুলি ।
আমার পরাণ করয়ে যেমন বেদন কাহারে বলি ॥

নরহরি দাসে গদ গদ ভাষে কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
অলি ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে সদা রাধা প্রেম ভোর॥

(৪) গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শিরে ঘসে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেম হইয়াছে ভোরা॥

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসামায়িক কবিগোষ্ঠীর সকলেই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের প্রধান সাহিত্য-শিষ্য বাসু ঘোষের মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ একেবারে অভিন্ন। ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বাদশমাসিক লীলা বর্ণনায় তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করেছেন।

শ্রীমৎ নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুকরণে বাসু ঘোষ ব্রজগোপীর ভাব আরোপ করে কতকগুলি নদীয়া নাগরী ভাবের পদ রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের রূপাকর্ষনজনিত গভীর অনুভূতি এই সকল পদের উপজীব্য বিষয় বস্তু।

বাসু ঘোষের দু-চারটী পদ উদ্ধৃত হল, যাতে পাঠকের কাছে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি স্পষ্ট হয়।

(১) জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন॥

নীলাচলে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধর ।
নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর ॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা ।
গোলকের বিভব লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার ।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত ।
যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

(২) গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল ।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥
শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি ।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাঁচনি ॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুকুন্দ ।
গৌরীদাস আদি যবে পাইল আনন্দ ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে ।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিয়া প্রকাশে ॥

(৩) আরে মোর গোরা দ্বিজমণি ।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী ॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে ।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় ।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল ।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥

(৪) মদন মোহন গৌরাঙ্গ বদন
রূপ হেরি কিনা হৈল মোরে ।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালা কানু
নহিলে কি মন চুরি করে ॥
রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা ।
কি হার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা ॥
নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া ।
আহা মরি মরি সোই মরম তোমারে কই
জীব নাগো গোরা না দেখিয়া ॥
হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জরজর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি ।
সুরধুনী তীরে যাঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি ॥
পুরুবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কালতনু গোরা ।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপী মন চোরা ॥

মহাপ্রভুর সমসামায়িক কবিগোষ্ঠীর সকলেই পদরচনার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন । শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান দুই জন, শ্রীমৎ নরহরি সরকার ঠাকুর ও বাসুদেব ঘোষের পদের দু-চারটি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখন এখানে অন্যান্য কবিদেরও দু-একটি করে পদ উদ্ধৃত করা হল যাতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় ।

গোবিন্দ ঘোষ :

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল ।
মুরলী মুরলী করি মূরছিত গৌরহরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল ॥
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ ।
বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ ॥
রাধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ ।
ললিতা বিশাখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশী বট
বলি পুন হরল চেতন ।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লবলেশে
ধিক্ রহু এ ছার জীবন ॥

মাধব ঘোষ :

তছু দুখে দুখী এক প্রিয় সখী
গৌর বিরহে ভোরা ।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমতি বাউরি পারা ॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী তীরে
যেখানে বসিতা পহুঁ ।
তথায় যাইয়া গদগদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু ॥

সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায় ।
নীলাচল পুরে যৈছন গৌড়ে
যাইয়া দেখিতে পায় ॥
আঁখি ঝরঝর হিয়া গরগর
কহয়ে কাঁদিয়া কথা ।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরম বেথা ॥

শিবানন্দ সেন :

(১) পূর্বে যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন ।
যে করে মুরলী বায় দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন ॥
অধরে মুরলী পুরি ব্রজবধূর মন চুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার ।
নয়ান কটাক্ষ বাণে মরমে পশিয়া হানে
সে মরণে বহে অশ্রুধার ॥
যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাখানে ।
নাহি জানি সেই এবে কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্তন স্থানে ॥
ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ
বিরহ অনলে জরি জরি ।
এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি ॥

(২) হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর ॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়ন নীর ॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥
খেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে পহুঁ করল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল ॥

পরমানন্দ গুপ্ত :

গোরা তনু ধূলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীতবসন বংশী চায় ॥
ধরি নটবর বেশ সম্মুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি সঘনে বোলায় হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা ॥
শুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া রোষ বোধ প্রিয় সব পরিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥

কেহ বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী ।
নিজমন আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দোঁহে ধরিবে পরাণী ॥

রামানন্দ বসু :

(১) ভাল ভালরে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলিকলমষ হরে
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া ॥
করতাল মৃদঙ্গরায় সঙ্গে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ বাসু রঙ্গে ।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে ॥
পুছে পহুঁ গৌরহরি কহে কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায় ।
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায় ।
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
বচন অমিয়া রাশি ক্ষণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দুবাহু তুলিয়া ॥
জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
অদ্বৈতর বাঢ়ল আনন্দ ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ ॥

(২) সুরধুনী তীরে আজ গৌরকিশোর।
ঝুলন রঙ্গরসে পহুঁ ভেল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোল॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মিলি।
গাওত পুরুষ রভসরঙ্গ কেলি॥
নদীয়া নগরে কহ ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

মুরারি গুপ্ত :

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গে মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে॥

বংশীবদন দাস :

শ্রীনন্দনন্দন শচীর দুলাল চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিনী কোঙর নিত্যানন্দ রায় ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাস সাঙ্গাইত অভিরাম স্বামী গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত গৌরদাস আসি তুরিত মিলিল দলে॥

নবদ্বীপ আজি গোকুল হৈল যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আবা আবা রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্য সাহিত্য যে অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তার প্রথম স্তর-বিষয়ে আলোচনা করে দেখা গেল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদাবলী রচনার বিষয়বস্তু ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের রূপ, ভাবাবেশ ও জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা।

এই কবিদের পরবর্তী কবিগোষ্ঠীর পদ আলোচনায় দেখা যাবে যে এঁদের বেশার ভাগই শ্রীচৈতন্যেদেবের পার্শ্বদদের শিষ্য এবং এঁদের কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ। ডক্টর সুকুমার সেনের A History of Brajabuli Literature গ্রন্থ অনুসারে এই সব কবিদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের তারিখ নীচে দেওয়া গেল।

লোচন দাস : জন্ম ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য।

বলরাম দাস : জন্ম ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ, নিত্যানন্দ ঠাকুরের শিষ্য।

জ্ঞানদাস : জন্ম ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ, নিত্যানন্দ ঠাকুরের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য।

গোবিন্দদাস : ১৫৩৫ খৃঃ—১৬১৩ খৃঃ, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

পদকল্পতরুতে সংগৃহীত লোচনদাসের পদসংখ্যা ২৯। এর মধ্যে ১৭৭৮—১৭৮৮ পর্যন্ত 'শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে বিষ্ণু প্রিয়ার বারমাসী' একটি পদ ধরা হয়েছে। অন্যান্য পদের মধ্যে তিনটি নিত্যানন্দ বন্দনা, একটি অদ্বৈত বন্দনা, ৫টি প্রার্থনা, একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বন্দনা, দুইটি রাধাপ্রেম; ৩টি নদীয়া নাগরী, এবং অন্যান্য আর সব শ্রীগৌরাঙ্গর রূপ মহিমা, কৃষ্ণাবতার ভাব, সন্ন্যাস ইত্যাদির পদ। লোচন দাসের কাবিখ্যাতির প্রধান কারণ তিনি 'ধামালী' পদ রচয়িতা। নীচে লোচিনদাসের দুটি ধামালী পদ উদ্ধৃত করা হল, তার মধ্যে একটি 'নদীয়া নাগরী'র পদ।

(১) জ্বালার উপর জ্বালা সই
জ্বালার উপর জ্বালা।
জল্‌কে যাই পথ না পাই
বসন টেনে কালা॥
সরম করা৷ ভরম কর‍্যা
বসন দিলাম সাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা
ধরে আমার হাতে॥
রস করিতে জানে যদি
তবে তো মনের সুখ।
গোপন কথা বেকত করে
এই সে বড় দুখ॥
চলমল্যাকে চতুর বলি
হেট মুড়্যাকে জপু।
রস জানিলে রসিক বলি
নৈলে বলি ভেপু॥
লোচন বলে আলো দিদি?
ইহা বল্‌লি কেনে?
কালার সমান রসিক নাই
এ তিন ভুবনে॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯১৫)

(২) আর শুন্যাহ আলো সই
গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥

হল্‌দি বাঁটিতে গোরী
বসিল যতনে
হল্‌দি বরণ গোরা চাঁদ
পড়্যা গেল মনে ।
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হল্‌দি বাঁটা ।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাস্যা গেল পাটা ।
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব
সম্বরিতে নারে ।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন
গেল ছারে খারে ॥
লোচন বলে আলো সই
কি বলিব আর ।
হয় নাই হবার নয়
গোরা অবতার ॥

ডঃ সুকুমার সেনের A History of Brajabuli Literature গ্রন্থের তারিখ অনুসারে বলরাম দাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ; তবে ডঃ সুকুমার সেনের মতে বলরাম দাস জ্ঞানদাসের আগে পদরচনা করেছিলেন এবং নীচে A History of Brajabuli Literature গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মত উদ্ধৃত করা হল ।

"Bal ram wrote his poems before the bulk of Jnanadasa's poems were written (because the latter being the disciple of Nityananda prabhu's wife must have been at least a few years younger than the former) and as such it is more than probable that Jnanadasa was influenced in this respect to some extent by Balaramdasa. It can be seen from a comparison of PKT 668

with 682 that Jnanadasa has virtually paraphrased a poem by Balaramdasa" (A History of Brajabuli Literature ; Chapter V. PP. 76-77) ।

নীচে তুলনামূলক সমালোচনার জন্য পদকল্পতরুর ৬৬৮ ও ৬৮২ সংখ্যক পদ দুটি উদ্ধৃত করা হল ।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৩য় শাখা, ৬ষ্ঠ পল্লব, রসোদ্গার ।

পদসংখ্যা ৬৮২

রাতিদিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে ।
উলটী পালটী চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ॥
সই ও দুখ লাগিয়া আছে মনে ।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে ॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি
নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে ।
ঘন ঘন করে কোলে খেণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখে চুমে ॥
খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায় ।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥
ধরিয়া দু'খানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
খেণে ধরে হিয়ার উপরে ।
খেণে পুলকিত হয় খেণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে ॥

পদসংখ্যা ৬৬৮

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

বলরাম দাস সম্বন্ধে A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন :

"Like Govindadasa Kaviraja, Balaram was a skilled metrician, and could write ornamental poetry. In A. P. R. there are three poems, in each of which every foot begings with a particular letter of the alphabet. The following poem has the letter "V" (b) at the begining of every foot :—

বিরহ বেয়াধি বেয়াকুল সো পহুঁ
বরভাল ধৈরয লাজ।
বাসর যামিনী বিলপি গোঙায়ই
বসি বসি বিপিনক মাঝ॥
বিধুমুখী বেদনা কি কহব আজ।

বিষম বিশিখ শর বরিখণে জর জর
বিকল বরজ যুবরাজ ॥
বহু বৈদগধী বিবিধ গুণ চাতুরী
বিছুরল সবহুঁ মুরারী ।
বরিখক ঠামে বোল তাহে পাবই
বাউরা ভেল বনমালী ॥
বেশ বিলাস বিশেষহি বিরমল
বিরমল ভোজন পান ।
বোলইতে বদনে বচন নাহি নিকসই
বলরাম কি কহব জান ॥

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে বলরাম দাস ভণিতায় ১৩৬টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু সংখ্যক পদ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, এবং সেগুলির অধিকাংশের মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণাবতার-ভাব, করুণা ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

বলরাম দাসের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাগণ বেশীর ভাগই মধুর ভাবের পদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন; বলরামের এ বিষয়ে কৃতিত্বের অভাব না থাকলেও বাৎসল্য রসের পদ রচনায় তিনি যে সমধিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, সেটি উল্লেখযোগ্য। A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন :

"Of the three great poets of Vaisnava lyric literature, Balaram, Jnanadasa and Govindadasa Kaviraja, Balaram is the only poet who has made a considerable achievement in depicting the mother's love and yearning for her child (Vatsalya rasa). Earlier Vaisnava poets as a rule did not neglect this field, but later poets generally occupied themselves with the sentiment of love (Madhura rasa) only. The following

poem will show Balaram's power of painting a realistic picture of maternal love in its most tender aspect :

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৩য় শাখা, ২২ পল্লব,
পদসংখ্যা ১২১৮

শ্রীদাম সুদাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায়ে জানি লাগে
প্রবোধ না পায় মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলে গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥

A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের জন্ম তারিখ একই (১২৩০ খৃষ্টাব্দ) দেওয়া আছে। জ্ঞানদাসের পদাবলী আলোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর প্রায় দুইশত পদের মধ্যে মাত্র ১৩টি পদ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক। এর মধ্যে একটি পদে গৌরাঙ্গের অবতার ভাব ৮টি পদে রূপ ও মহিমা, এবং ৪টি পদে ভাবাবেশ বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্ঞানদাস শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশের যে চারটি পদ রচনা করেছেন তার

কিছু বিশেষত্ব আছে। তিনি যে রাধাচিত্র অঙ্কিত করেছেন মনে হয় সে ছবি শ্রীগৌরাঙ্গেরই। তুলনায় বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। জ্ঞানদাস রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের বাসক সজ্জার পদ ঃ

বাসক সজ্জা

॥ ভূপালী ॥

সুরধুনি তিরে নব ভাণ্ডির তলে।
বসিয়াছে গোরাচান্দ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদি আর হিম ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
তাহি রচয়ে পহু ললিত শয়ান।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ান॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসক সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃষ্ঠা ১০)

(খ) বাসক সজ্জা

৪

॥ ধানশী ॥

অপরূপ রাইক চরীত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকীত॥
কিশলয় শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন প্রদীপ।
তাম্বূল কপূর খপূরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥

মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
পুন তেজত পুন লাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখিমুখ চাই॥
কিঙ্কিণি কঙ্কন মণিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহুঁ পর বোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃষ্ঠা ১৩৭)

এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জ্ঞানদাসের পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"আধুনিক কবিগণের কবিতা আলোচনায় কবি মানসীর প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি এই জ্ঞানদাসেরই সুবিখ্যাত 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন' পদের আলোচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবির মানসীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। কবির উক্তি— "অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা—'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'.........সে দিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে। চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের কবিতা আলোচনায় প্রাচীন সমালোচকগণও এই মানসীকে স্বীকার করিয়াছেন। জয়দেবের বিবাহিতা পত্নী পদ্মাবতী, চণ্ডিদাসের পরকীয়া 'রজকিনী রামী' এবং বিদ্যাপতির মিথিলারাজমহিষী লখিমি রাণী সেকালের সমালোচকগণের চক্ষে এই মানসীর আসন অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী কবিদের চোখের

কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল না। শ্রীরাধিকার ছবির পিছনে বৈষ্ণব কবিগণের চোখের কাছে যাঁহার শ্রীমূর্তি ছিল তিনি পৃথিবীর প্রেম বিগ্রহ বাঙ্গালীর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। যিনি মানবের দুঃখে অমৃতলোক গোলোক হইতে মরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; মানুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বনরাজী কলিমা যাঁহার চক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের শ্যাম শোভায় রূপান্তরিত হইত। সাগরের উত্তাল কলরোল যাঁহার কর্ণে কালিন্দী জল কল্লোলের প্রতিধ্বনি বহিয়া আনিত। চটক পর্বত যাঁহার হৃদয়ে গোবর্দ্ধনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। সেই রাধাভাব দ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অপর অনেকে এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এবং তাহার পার্ষদগণের দিব্য জীবনকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলে আমাদিগকে কবি-মানসীর অনুসন্ধানে আর পণ্ডশ্রম করিতে হইবে না।”

জ্ঞানদাসের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশের পদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য আর একটি অনুমান দৃঢ় হয়। জ্ঞানদাসকে অনেক সুপণ্ডিত সমালোচক চণ্ডীদাসের সাহিত্য শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে অনুরূপ ভাবাবেশ বর্ণনায় শ্রীগৌরাঙ্গের ছবির সঙ্গে শ্রীরাধার ছবির কোনো পার্থক্য নেই। নীচে দু চারটি পদ উদ্ধৃত করা হল যাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

(১) গৌরসুন্দর মোর।

কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে নয়নে গলয়ে লোর ॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে ॥

অবলা নারীরে করে জরজর বুকের মাঝারে পশি ।
কহিতে ঐছন পূরুব বচন অবনত মুখশশী ॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা মরম কেহনা জানে ।
পূরুব রচিত সদা বিভাসিত দাস নরহরি ভণে ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৮৫৩)

(২) (আগো) রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা ।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা ॥
আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি ।
হসিত বদনে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৩০)

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস রচিত .পদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাব-সাদৃশ থেকে জ্ঞানদাসের রচনায় চণ্ডীদাসের প্রভাব খুবই বেশী এ অনুমান অযৌক্তিক নয়, আর এ অনুমান সত্য হলে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পূর্ববর্তী কবি এ কথাও স্বীকার করতে হয় । এই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয়, যে কবি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের

ছবি শ্রীরাধার মুখের ছবিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী নন, এই অনুমানই স্বাভাবিক।

চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান হয় নি এবং এ বিষয়ে বহু বিভিন্ন মত এখনো প্রচলিত, তবে পদাবলীর চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কবি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী এ মত অনেকেই পোষণ করেন। এখানে মণীন্দ্রমোহন বসুর মত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় মণীন্দ্রমোহন বসু বহু যুক্তিতর্ক ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পদকল্পতরুতে সংগৃহীত বিভিন্ন ভণিতায় চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদগুলি একই কবির রচনা, এবং ভূমিকার 'কাব্য রচনার সময় নিরূপণ' নামাঙ্কিত অধ্যায়ের শেষের দিকে সমস্ত যুক্তিতর্ক অবতারণার উপসংহারে বলেছেন : "পদকল্পতরুতে যে সকল কবির বাঙ্গলা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী যুগের কবি। অতএব ঐ সকল পদের সমধর্মী প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীও চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় না। উপরে কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল, তাহাদের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়াই চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্বরাগের পালাতেও অনেকগুলি কবিত্বময় পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদগ্ধমাধবের শ্লোকের ভাবানুবাদের পদও রহিয়াছে। সেগুলি সন্দেহজনক বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না। নতুবা ইহাও বলা যাইত যে, যে কবি বিদগ্ধমাধবের শ্লোক অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি কখনও চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু যাঁহারা সন্দেহ অবকাশে চণ্ডীদাসকেই ঐসকল পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কবি রূপ গোস্বামীর পরবর্তী যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাসের কাব্য-রচনার সময় নিরূপণ করার উদ্দেশ্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে একটি চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের রচিত পদাবলীতে

অনুসৃত উজ্জ্বল নীলমণির নির্দেশ সংক্রান্ত। প্রয়োজনবোধ সেই যুক্তিটি এখানে উদ্ধৃত হল।

"৪। উজ্জ্বল নীলমণিতে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য ভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ বলা হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তী সকল রসশাস্ত্রেই প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিবর্তে করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝা যায় যে করুণ বিপ্রলম্ভের স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরে ইহা হইতেই যে আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যুগল মধুরসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (পৃঃ ৫৭৯—৫৮২ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থেও প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং কবি উভয় পর্যায়ভুক্ত পদই রচনা করিয়াছেন।"

(দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী : ভূমিকা, পৃঃ ২)

উজ্জ্বল নীলমণিতে 'বিপ্রলম্ভ'র যে চারটি ভাগ করা হয়েছে তার সঙ্গে অভিসার ও ভাব সম্মেলনের পদ একত্র করে পূর্বরাগ, মান, কলহান্তরিতা, মাথুর এবং ভাবসম্মেলন—এইরকম একটি পর্যায়ক্রম দাঁড়ায় যার সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধির ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধন পদ্ধতির স্তরগুলির সুস্পষ্ট মিল আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষের দিকে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী যে সব কবি একদিকে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের বর্ণনাকে অবলম্বন করে শ্রীরাধিকার নানা অবস্থার কল্পনা করেছিলেন, অন্যদিকে পদাবলী রচনায় এমন একটি পর্যায়ক্রম অনুসরণ করেছেন, যার অন্তর্নিহিত ভাব গভীরতায় তার মধ্যে ভক্তি-সাধনার স্তর পর্যায়ের ইঙ্গিত মেলে, তাঁরা 'মহাজন' বা সাধক কবি বলে খ্যাত হয়েছেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই 'মহাজন' গোষ্ঠীর কবি। গোবিন্দদাস এঁদের সমসাময়িক; পদের অন্তর্গত ভাব-সাদৃশ্যের জন্য তিনিও এই গোষ্ঠীরই অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তবে তিনি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন, এবং তাঁর রচিত পদগুলির শব্দ, ঝঙ্কার ও ধ্বনি মাধুর্যের ঔৎকর্ষের জন্য অনেকে তাঁকে বিদ্যাপতির সাহিত্য শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণব 'মহাজান' কবিদের রচনায়

এক এক কবি এক এক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দ-দাসের রচিত পদাবলীতে অভিসার পর্যায়ের পদের সংখ্যা বেশী। (এই পদগুলি রচনা-মাধুর্যে সমগ্র বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই পদগুলির মধ্যে সাধন পথের দুরূহতার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।) এখানে গোবিন্দদাসের কয়েকটি অভিসারের পদ উদ্ধৃত হল।

(১) কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি চরি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থা গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০০১)

(২) মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার ।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতি
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি ।
তা' পায়ে মেলি চলল বর রঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥
যত যত বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র ।
গোবিন্দদাস কহই অব সমঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥
(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০০৪)

(৩) মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট ।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তাঁহি অতি দূরতর বাদর রোল ।
বারি কি বারই নীল নীচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার ।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত ।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার ।
হেরইতে উচকিত লোচন তার ॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার
ছুটল বান কিয়ে যতন নিবার ॥
(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৮৭)

(৪) কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঙে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচরি! মঝু পরিখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অনুসর
সহচরি পাওল বোধ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৮৮)

গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও পদ রচনা করেছিলেন। A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবিরাজের তারিখ দেওয়া আছে ১৫৩৫—১৬১৩ খৃষ্টাব্দ। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন: "কিন্তু গোবিন্দদাস, বল্লভ ও বসন্তরায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছিলেন—এই কথা মনে রাখিলে আর শতাব্দীর স্থূল হিসাবের ফেরে পড়িতে হইবে না।"

ষোড়শ শতাব্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এর পরবর্তী যুগ সপ্তদশ শতাব্দীতে পদ রচনার মাধ্যমে শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী-রচিত রসশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টাই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়ে ছয় গোস্বামী রচিত কাব্য নাটক অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করে আসেন, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের রচনায় শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যদেরই প্রভাব দেখা যায়।

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকা শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন ঃ "সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উদ্ভব হয় নাই। শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাব্য নাটক অলঙ্কারাদির অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষায় পদ রচনা করা ও রসশাস্ত্র প্রচার করাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য।" সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনশ্যাম দাস। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য যদুনন্দন বিদগ্ধমাধব ও গোবিন্দলীলামৃতের সুললিত ভাবানুবাদ করে এবং স্বতন্ত্রভাবেও পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এই যুগে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনশ্যাম দাসের রচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজের গভীর প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে একটি পদ উদ্ধৃত করা হল।

সহজই বিষম   অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটীল কটাখি।
হেরইতে হামারি   ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরয শাখি।
এ সখি বিহরয়ে   কো পুন এহ।
পীত বসন জনু   বিজুরি বিরাজিত
সজল জলদ রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাষ   হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ আগি।
যাকর ধূমে   ধরম পথ কুলবতী
হেরই রহু পুর ভাগি

তাঁহি পুন বেণু অধরে ধরি কুকরই

দহইতে গৌরব লাজ।

কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন

অন অন হৃদয়ক মাঝ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৫০)

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব কবি কেউ আবির্ভূত না হলেও, যাঁরা পদরচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন ঘনশ্যামদাসের রচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজের পদ রচনার প্রভাব তার প্রমাণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর পরের যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাধামোহন ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্রের পৌত্র (Great great grandson)"। 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন: "১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রাধামোহন বাংলার পরকীয়াবাদীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।" এ বিষয়ে A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন-যা বলেছেন, উদ্ধৃত করা হল:

"Radhamohona was one of the biggest Vaishnava Scholar of his time. When he was a young man, there arose an acute doctrinal difference between the two Schools of Vaishnava thought. One School supported the doctrine of 'Svakiya' and the other the doctrine of "Parakiya." This controversy come to such a head that an assembly of all the leading Vaishnavas was called, and the leaders of the two Schools were asked to discuss their doctrines publicly and to accept the judgement of the assembly.

Radhamohona was chosen as the leader of the 'Parakiya' School. After a protracted and lively discussion, Radhamohona vindicated the doctrine of his School, and was given a certificate to that effect, signed by all the Vaishnava scholars present. This document was registered at the court of Murshidkuli Khan on the 17th Phalguna 1125. B. E. (March, 1718 A. C.)

রাধামোহন তাঁর সঙ্কলন গ্রন্থ, 'পদামৃত সমুদ্রে'র জন্যই সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রায় ৭৩০টি পদ সংগৃহীত হয়েছে ; তার মধ্যে ১৮৫ টি রাধামোহনের নিজস্ব রচনা।

রাধামোহন সংস্কৃতে 'মহাভাবানুসারিণী' নামে পদামৃত সমুদ্রের একটি টীকা রচনা করেন এবং এই টীকার জন্যই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পদরচনায় রাধামোহন গোবিন্দদাস কবিরাজকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেছিলেন। নীচে রাধামোহনের পদ উদ্ধৃত হল :

(১) নূপুর কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই বলই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার॥
সজনি। অদভুত কানুক নেহ।
আগুসরি আদর ভাবহি বাদর
কি করব না পায়ই থেহ॥
কর গহি সঙ্কেত লেই পরবেশই
করু নিরজন নিজ হাত।
শীকর যুত সরসিজ দলে বীজই
মলয়জ লেপই গাত॥

রাই পুন দরশ পরশ রসে নিমগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মীটব পুরুবক দুখ॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০৪২)

রাধামোহন শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় নরহরি সরকার প্রমুখ শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের একান্ত অনুসারী। নীচে একটি পদ উদ্ধৃত হল:

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলুঢুলু অরুণ নয়ান।
কহইতে রস রস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে পহু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরা-গুণ গায়॥

(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০৯২)

রাধামোহনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবি নরহরি চক্রবর্তী। এঁরও অপর নাম ঘনশ্যাম।

রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক ; এবং নরহরি চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথের পুত্র।

নরহরি চক্রবর্তী তাঁর সঙ্কলন-গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তাদের ৩১৪টি পদ সংগৃহীত

হয়েছে, যার মধ্যে ১৩৫ টি তাঁর নিজস্ব রচনা। নরহরি চক্রবর্তী 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামে আর একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থে প্রায় ২৫০০ পদ সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগই তাঁর নিজস্ব রচনা।

নরহরি চক্রবর্তী উঁচুদরের কবি ছিলেন না, তবে ছন্দের উপর তাঁর খুব দখল ছিল, তিনি সংগীত শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। যে ভাব-গভীরতায় ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী অতল স্পর্শ মহিমার অধিকারী হয়েছিল, নরহরি চক্রবর্তীর পদরচনায় তার রেশটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু নরহরি চক্রবর্তীর নদীয়া-নাগরী পদে মার্জিত রুচির অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এখানে তুলনামূলক আলোচনার জন্য নরহরি সরকার ঠাকুর ও নরহরি চক্রবর্তীর দুটি পদ পাশাপাশি উদ্ধৃত হল।

(১) বেলি অবসান কালে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই থা॥
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল
বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী
যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল
গোরাচাঁদের অনুরাগে॥

(নরহরি সরকার ঠাকুর)

(২) পুনঃ ললিত।

হেদে গো সজনি! রজনী স্বপন
বিরলে বলিয়ে তোরে।
রসিক শেখর গোরা রসভরে
অথির হৈয়া মোরে॥
হাসি হাসি আসি কুচ পরশিতে
তরসি ঠেলিলুঁ পানি।
মনের উল্লাসে পাশে বসি কত—
কহয়ে কাকুতি বাণী॥
নয়ানের কোণে চাহিলুঁ তা পানে
তখনি নাগর রাজ।
বদনে বদন ঝাঁপি কাঁপে ঘন
অমনি পাইলুঁ লাজ॥
নরহরি পহুঁ পরাণ পুতলি
এত বা জানয়ে রঙ্গ।
সাধে করি কোলে অলপে অলপে
তলপে গড়ায় অঙ্গ॥

(নরহরি চক্রবর্তী, গীতচন্দ্রোদয় ঃ পূর্বরাগ)

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর যে উচ্চ গ্রামে বাঁধা হয়েছিল, তার রেশ সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ক্ষীণ হতে থাকে; সপ্তদশ শতাব্দীতে ঘনশ্যাম দাস ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রখ্যাত পদকর্তাদের বিশেষ করে গোবিন্দদাস কবিরাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৈষ্ণব পদাবলীর লুপ্তপ্রায় গৌরব ও মহিমা অনেকখানি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর রাশি রাশি পদ রচনার মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীর গীত-মূর্ছনা একেবারেই হারিয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : Chandrasekhara was a good metrician and that his poems are entirely free from the monotonousness of the contemporary Brajabuli Literature.

*   *   *   *   *

The popular appeal of the lyrics of Sashisekhara seems to have been greater than that of his brother, and this he fully deserves. (A History of Brajabuli Literature, Pp—323-24, 327)

চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই ভাইয়ের কবিত্বগুণ যথেষ্ট থাকলেও ভাব গভীরতা নেই, সে কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন : "অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শশিশেখর, চন্দ্রশেখর ও জগদানন্দ শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের কোন পদই অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন পদসঙ্কলনে স্থান পায় নাই। তবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে সঙ্কলিত 'পদরসসারে' ও 'পদরত্নাকরে' ইঁহাদের পদ আছে। শশিশেখর ও জগদানন্দের পদের শব্দ ঝঙ্কার ও ছন্দ বৈচিত্র্য অতুলনীয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর স্বাভাবিকতা তাঁহাদের রচনায় বিরল।" (পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃঃ—২৪৮) নীচে চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ও জগদানন্দের তিনটি পদ উদ্ধৃত হল।

১) কহে তুহু কলহ করি   কান্ত সুখ তেজলি
        অবসে বসি রোঅসি কাহে রাধে।
    মেরু সম মান করি   উলটি যব বৈঠলি
        নাহ তব চরণ ধরি সাধে॥
    তবহু তারে গারি   ভর্ৎসন করি তেজলি
        মান বহু রতন করি গণলা।
    অবহুঁ ধরম পথ   কাহিনী উগারই
        রোখে হরি বিমুখ ভই চললা॥

কাতরে তুয়া চরণ যুগ   বেড়ি ভুজ পল্লবে
        নাহ নিজ শপতি বহু দেল ।
নিপট কটুনাদি কোটি   কঠিনী বজরাবুকী
        কৈছে কর চরণপর ঠেল ।
অবহুঁ সব সখিনী তব   নিকটে নাহি বৈঠব
        হেনই অবিচার যদি করলি ।
চন্দ্রশেখর কহে   কতয়ে সমুঝয়েল
        মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি ॥

(চন্দ্রশেখর, কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৩০)

২)   দামিনীদাম-দমন রুচি দরশনে
        দূরে গেও দরপকি দাপ ।
শোণ কুসুম তাহে কোন গণইরে
        প্রাতর অরুণ সন্তাপ ॥
গোরারূপের যাঙ বলিহারি ।
হেরি সুধাকর   মূরছি চরণতলে
        পড়ু দশনখ রূপধারী ॥
সুবরণ বরণ   হেরি নিজ কুবরণ
        মানি আপন মন তাপে ।
নিজতনু জারি   ভসম সম করইতে
        পৈঠল অনল সন্তাপে ॥
যা সম বিধিক   অধিক নাহি অনুভব
        তুলনা দিবার নাহি ঠোর ।
জগদানন্দ কহু   পহুঁক তুলনা পহুঁ
        নিরুপম গৌর কিশোর ॥

(জগদানন্দ, জগদানন্দপদাবলী ১০)

৩) অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা ।
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥
কোকিল কুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্কারে কুসুমে ।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি নামে ।
যইখনে শুনে তইখনে উঠে
নব রাগিণী গানে ॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া ।
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জীউ কাটিয়া ॥

(শশিশেখর)

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব কবির পদ রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে নব জাগরণের জোয়ার এসেছিল তার মূলে বৈষ্ণব পদকর্তাদের দান অনেকখানি। এর প্রমাণ উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান কবি ও সাহিত্যিকদের রচনায় বেশ কিছু বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

৪

বাংলা কাব্য সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব

পূর্ব পরিচ্ছেদের বিস্তৃত আলোচনায় এই কথাটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'বৈষ্ণব পদাবলী' বলতে বাংলা সাহিত্যে যে গীতি-পদ-সমষ্টি বোঝায় তার রচনাকাল ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দী। এর কারণ অনুসন্ধান করে পণ্ডিত গবেষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'গীতিকবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (পৃঃ ৪২) একটি মন্তব্য করেছেন; মন্তব্যটি প্রয়োজন বোধে এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং ইহার ধর্মবোধের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার রসাভিব্যক্তি পদাবলীর মধ্যেও আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালে এদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিত হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় নাই; ইহার কারণ ইহার সম্মুখে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুস্পষ্ট আদর্শটি তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; তারপর চৈতন্যধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর যখন ইহার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ সমাজের সম্মুখে স্থাপিত হইল, তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হইল। চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব তার প্রকট-কালেই বাংলা দেশের উপর হইতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি সমাজের উপর চৈতন্যধর্মের আদর্শের প্রভাব যতদিন সক্রিয় ছিল, ততদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীও ইহার লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইতে পারে নাই; কিন্তু এই প্রভাব অধিককাল এই সমাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে

নাই, তখন হইতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শও শিথিল হইতে লাগিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ইহার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। একান্তভাবে বিশেষ একটি ধর্মচেতনা ও ভক্তি-বিশ্বাস ইহার অবলম্বন ছিল বলিয়া ইহার ক্রমবিকাশের ধারা সেই ধর্মবিশ্বাসেরই ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল ; সেই জন্যেই ইহার উভয়ের বিনাশ এক সঙ্গেই সম্ভব হইল, এককে বাদ দিয়া অপর বাঁচিতে পারিল না।" খেতুরীর উৎসবের পর পদাবলীকীর্তন ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গে পরিণত হল। গড়ানহাটী, মনোহরসাহী, রেণেটী ও মন্দারিণী এই চারটি ভাগে কীর্তন গানের পদ্ধতিকে ভাগ করা হল এবং এই সঙ্গে পদ-মধ্যে কীর্তনীয়ার নিজস্ব ব্যাখ্যা বা 'আখর' যোজনার রীতি প্রচলিত হল।

বিভিন্ন পদ্ধতির কীর্তন গানের সুর ও তালের ব্যাপক বৈচিত্র্যের জটিলতা ও আখরের পর আখর যোজনার ফলে পদের অতি-বিস্তৃত ব্যাখ্যার বোঝায় পদাবলী কীর্তন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যে, জনসাধারণের কাছে তার আবেদন অনেকাংশে কমে গেল। যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-উৎসারিত রসের আস্বাদে বাঙালী জনসাধারণের প্রাণ-মন ভরে যেত, পদাবলী কীর্তনের সে রসাস্বাদ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল।

এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার পল্লী অঞ্চলে কতকগুলি নতুন গীত-পদ্ধতির উদ্ভব হল, যেগুলিকে কীর্তন-ভাঙ্গাই বলা চলে। এই গীত পদ্ধতিগুলির মধ্যে ঢপ-কীর্তন, পাঁচালী, যাত্রা ও কবিগান উল্লেখযোগ্য।

কীর্তন ও ঢপ-কীর্তনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঢপ-কীর্তনের খানিকটা অংশ কথকতা, আর শহর অঞ্চলে ঢপ শুধু মেয়ে-কীর্তনীয়ারাই গান করত।

পাঁচালীর সঙ্গে কীর্তনের তফাৎ এই যে, পাঁচালীর গায়েন গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি করত, কখনও পাত্রপাত্রীর সাজ সাজত, কখনও ব্যঙ্গ কৌতুকের অবতারণা করত। পাঁচালী ও যাত্রার তফাৎ মাত্র এইটুকু যে, যাত্রা গানের মূল গায়েন বা পাত্র একের অধিক সাধারণতঃ তিনজন থাকত। প্রথম দিকে যাত্রার বিষয় ছিল শুধু কৃষ্ণলীলা-কাহিনী, বিশেষ করে কালিয়দমন। পরে চৈতন্য-যাত্রা, চণ্ডী-যাত্রা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। কবিগানের বিষয় থেকেই বোঝা যায় যে, তার ওপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন 'পাঁচালী' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ

"পাঁচালীর দুই প্রধান রীতি—(১) প্রাচীন পদ্ধতি, যাহাতে গায়েনের পায়ে নূপুর ও হাতে চামর মন্দিরা থাকিত, আর (২) নবীন পদ্ধতি, যাহা কীর্তনগান হইতে উদ্ভূত।

শেষের পদ্ধতির একটি রূপান্তর 'ঢপ-কীর্তন' নামে প্রসিদ্ধ।"

১২২০-৭৫ সালের মধ্যে যশোর জেলার উলুশিয়া গ্রাম নিবাসী মধুসূদন কান ঢপ-কীর্তন রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মধুকানের রচনার একটি উদাহারণ নীচে দেওয়া গেল।

রাজনন্দিনী পড়লো ধরায়
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয়।
কমলিনী আয়গো তোরা এরাই যেন যায় মথুরায়॥

কর দিয়ে দেখ নাসায়
বুঝি প্যারীর জীবন নাশ হয়
জীবন রইল যার আশায় সে যদি আসিয়ে বাঁচায়।

ওমা এসে দেখি রক্তেতে দন্ত
কি হলো পাইনে তদন্ত
এমনি কৃদন্ত
বুঝিলাম তবে তদন্ত
রাজনন্দিনীর সময় অন্ত
কোথায় রহিলে অন্ত অন্তে এসে হওহে উদয়॥

হলো ভাল করলে ভাল
গেল হে জানা
কৃষ্ণ প্রেমে নারী মোল
রইল ঘোষণা

একথা শুনিলে কানে
ত্রিজগতে মানবে কেনে
সূদন বলে কানে কানে
মানব না আর কানুর কথায় ॥

(শ্যামলাল শীল কর্তৃক ১০৩৩ সালে প্রকাশিত 'ঢপ-কীর্তন')

'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে' ডঃ সুকুমার সেন জয়নারায়ণের কাব্য থেকে পাঁচালী গানের একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। নীচে সেটি উদ্ধৃত হল।

॥ গীত পাঁচালী ॥
॥ তাল খেমটা ॥

এখন আর কেমন কর‍্যা বলিবে তোরা রাধা কলঙ্কিনী ॥ ধুয়া
জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত
তাহা মুই কবো কত
অবিরত বলিতে লজ্জা পায়
পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত
নারীর চরিত্র যত
অভিভূত শুনিয়া সবাই
ঘরে ঘরে করে কানাকানি ॥

॥ দোসরা গীত ॥
॥ নারদ বাসুদেবের উক্তি ॥
॥ রাগিনী ঝুমুর ॥
॥ তাল খেমটা ॥

এই কলঙ্ক ভঞ্জনের কথা শুনি নারদমুনি ॥ ধুয়া ॥
বাসুদেব সঙ্গে করি আসিল অবনি ॥

অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান
দেখা হইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড়পাণি ॥
বাসু কহে কোন্ কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে
জাতি-কুল কহ তার থাকে কার ঘরে
জনমিয়া দেখি নাই তারে বল কেমন কর‍্যা চিনি ॥
মুনি কহে নীলকান্ত জিনি রূপ তার
আভীর জাতির মধ্যে আছেন এবার
বৃন্দাবনে বাস তার নন্দ ঘরে যার মাতা নন্দরাণী ॥
বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয়
মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তখনি ॥
বৃন্দাবন পথ ভুলি যায় দিল্লী পানে
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান অন্ধ জনে ॥
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেরিল নীলমণি

॥ বাসুদেবের গীত আরম্ভ ॥
॥ রাগিনী সুহিনি ॥
॥ তাল পশতো ॥

রূপ দেখিয়া অবাক হইল নারদেয় বাসু ॥ ধুয়া ॥
চরণতলে দেখ কত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পরধুয়া ॥
ঘুঙ্গুরু বাজে নূপুর বাজে অভয় দিছে আশু
চরণ কমল হেরি হইল উল্লাসু ॥
করিতে স্তুতি নাহিক জানি আমি অতি পশু
তোমার তত্ত্ব লৈতে মুনি পাঠাইলা যাসু ॥

পিতামহের তাত তুমি এবে হইলা শিশু
না দেখি বিমল পদ মুনিবর ত্রাসু ॥
আজ্ঞা হৈলে মুনিবরে আনে গিয়া বাসু
অজ্ঞান পাপীর পাপে মার জ্ঞান ইষু ॥

॥ গীত মুনি উক্তি
॥ রাগ ভৈরব ॥
॥ তাল চলতা ॥

কখন সে হরি পদ দেখিবে এ দীন ॥ ধুয়া
পাইয়া চরণ সুধা
শান্ত হবে আশা ক্ষুধা
নয়ন চকোর তাহে হইয়া রবে লীন ॥
হরি-পদ মহাতরি
হেরিলে যাইব তরি
পার হব ভববারি আমি দীনহীন ॥
সে পদ সুচারু ভানু
পাপ নাশে মম তনু
জপিব তাহার মনু ত্যজি পরাধীন ॥
সে পদ নির্মল জল
তাহে রব অবিকল
প্রাণ মম দুই দল হবে তাহে মীন ॥
সে পদ অচল তলে
বন্ধি মন সুচঞ্চলে
তনুতরি নাহি টলে হইব প্রবীন ॥
দেখিয়া চরণখানি
ধরে পদ দিয়া পানি
পূর্ণ ব্রহ্ম জান্যা মুনি বাজাইল বীণ ॥

অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে
মুখে বলে হরে হরে
বারবার নতশিরে করে প্রদক্ষিণ ॥
নারদের নিবেদন
শুন প্রভু নারায়ণ
তোমার অধীন হন সদা গুণ তিন ॥ গীত সাঙ্গ ॥

পাঁচালীর পরেই কীর্তন-ভাঙ্গা নতুন পদ্ধতির লোক-গীতির মধ্যে 'কবিগানের' উল্লেখ করতে হয়। এর আগেই বলা হয়েছে 'কবিগানে'র বিষয় বস্তুর আলোচনা করলেই তার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পর্ক বোঝা যাবে। কবিতে চার প্রকারের গান থাকে, মালসী, সখী-সংবাদ গোষ্ঠ ও কবি। এর মধ্যে ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপক গানের নাম মালসী। মালসীর মধ্যে আবার যেগুলি বিস্তারিত ও নানা প্রকার সুর তালের সঙ্গে গাওয়া হত সেগুলিকে বলা হয় 'ভবনী', আর যেগুলি এক মাত্র তালে চমৎকাসুরে গাওয়া হত সেগুলি 'ডাক মাল্‌সী'। সখী সংবাদে বসন্ত, বিরহ, ভোর বা প্রভাতী ইত্যাদি গানে নায়ক-নায়িকার সুখ দুঃখ আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার মিলন-বিচ্ছেদের বর্ণনাই বেশী। বাৎসল্য রসাত্মক গানের নাম গোষ্ঠ। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাখালদের সঙ্গে গোচারণ, যশোদার কাতরতা, এইগুলিই গোষ্ঠের বিষয়।

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮) 'কবিগান' সম্পর্কে বলেছেন : "পূর্ববঙ্গে খেউড় গানের অপর নাম লাল গান। সমগ্র কবি-সঙ্গীত সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিওয়ালারা বৈষ্ণব পদাবলীকারদের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। সহজিয়া সাহিত্যের তত্ত্বগন্ধী স্থূলত্ব কবিগানের কাব্যের বিষয় না হইয়া পদাবলীর শুচিস্নিগ্ধ মাধুর্যের অমৃতধারায় কবিগানের অঙ্গন সিক্ত হইয়াছে।"

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে কবিওয়ালাদের যোগাযোগ বড় স্পষ্ট—এই মন্তব্য করে 'সাহিত্য-সংহিতা আষাঢ় ১৩১২' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রয়োজন বোধে সেই উদ্ধৃতিটি এখানে উদ্ধৃত করা

হল : "বৈষ্ণব কবিদিগের সুধাসিক্ত কণ্ঠের কাব্যরাগিণী নিঃশেষ হইবার অব্যবহিত পর হইতে এক অভিনব শাখা বহির্গত হইয়া বঙ্গবাসীকে প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই কবিওয়ালা নামে সুপরিচিত।"

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে 'সংবাদ প্রভাকর, মাঘ সংখ্যা ১২৬২' থেকে রাসু ও নৃসিংহ রচিত ৭টি কবিগান উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তারই একটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

মহড়া

প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে॥

চিতেন

পার্বতীনাথেরো অর্ধ শশধরো,
সবিতা অর্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দূরো ভালেতে॥

অন্তরা

হায়, মথনের বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠ দেশো নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রয়েছে ঘোষণা॥

চিতেন

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্ক সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥

অন্তরা

হায়, সে এমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণনাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে॥

চিতেন

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন মন তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥

অন্তরা

হায়, ত্রিলোচন হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভোরা পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণো যুগলে॥

চিতেন

ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণো যুগেতে
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,
কপালে কঙ্কণ আঘাতো॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক-গীতির মধ্যেই যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; এই শতাব্দীতে রচিত যে শাক্ত পদাবলী বাংলা কাব্য সাহিত্যের একটি গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে, তার রচনামূলেও রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর রচনারীতি ও ভাবমাধুর্য। রচনারীতির সাদৃশ্যের জন্যই শাক্ত-গীতিগুলিকে 'শাক্ত পদাবলী' বলে অভিহিত করা হয়েছে, আর ভাবমাধুর্যের দিক দিয়ে যশোদা ও মেনকার বাৎসল্যের প্রকাশ একই পর্যায় পড়ে।

রচনারীতি ও অন্তর্নিহিত ভাব সাদৃশ্য বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর যাই থাক, বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট। বৈষ্ণব পদবলীতে 'ঐশ্বর্যভাব অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের পদানত', কিন্তু শক্ত পদাবলীতে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সংমিশ্রণ; তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী-চেতনা, আর শাক্ত পদাবলীতে লক্ষ করা যায়—ব্যক্তি-চেতনার অস্পষ্ট উন্মেষ। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর বৈসাদৃশ্যের মধ্যে শাক্ত পদাবলীর যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাতে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা দেখা যায়। সাদৃশ্যের চেয়ে গভীরতর বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও শাক্ত পদাবলী রচনার মূল প্রেরণা বৈষ্ণব পদাবলী থেকে এসেছে, একথা জোর করে বলার কারণ এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী যে ভক্তি-রস থেকে উৎসারিত তার মূল কথা, অতীন্দ্রিয় ভাবলোক ও কল্পলোকের সু-উচ্চ আসন থেকে নামিয়ে এনে ভগবানকে বুকের অত্যন্ত কাছে আপন করে পাওয়ার প্রচেষ্টা। সমগ্র শাক্ত পদ সাহিত্যে বিশেষ করে সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে বৈষ্ণব পদাবলীর এই ভাবমাধুর্য বিশেষভাবে প্রকাশিত। শাক্ত পদাবলীর পাশাপাশি রচিত হয়েছিল মহাকবি ভরতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল'। অষ্টাদশ শতাব্দীকে যদি 'মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য' যুগ বলা যায়, তবে তার পূর্ণ পরিণতি ভরতচন্দ্রের কাব্যে হয়েছিল এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ভাষা, ছন্দ ধ্বনি, ঝংকার সুষমা, লালিত্য বাগবৈদগ্ধ সব বিষয়ে শিল্প-দক্ষতা ভরতচন্দ্রের অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের ছিল এবং তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। ভরতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনার মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করবার সূচনায় এক একটি ধুয়া (ধ্রুবপদ)

নায়ক গীত রচনা করেছেন। 'অন্নদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে এই ধুয়াগুলি প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, এগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। নীচে এরকম তিনটি 'ধুয়া' উদ্ধৃত হল :

১) ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছশক্রধনু।
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে ॥.....

২) আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে ॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
লুকায়ে পীরিতি কৈনু কুল কলঙ্কিনী হৈনু
আপনি পরাণ মোর আকুল পাথারে ॥......

৩) কারে কব লো সে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর ॥ ....

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী পাশাপাশি রচিত চণ্ডীমঙ্গলগুলিও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবমাধুর্য ও ললিত মধুর রচনা পদ্ধতির প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

"চণ্ডীকাব্য যে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের সহিত তুলনায় অনেক অর্বাচীন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহার উপর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রভাবে। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের দুই প্রাচীনতম প্রবর্তকই বৈষ্ণব ভাব ও কাব্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।"

এরপরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষ্ণুপদ' ইত্যাদি রচনার উল্লেখ করে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মুকুন্দরাম সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "তাঁহার কাব্যের অন্যত্র বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নায়িকার রূপ বর্ণনায় পদাবলীর কান্ত-কোমল মাধুর্য সুপরিস্ফুট। তাঁহার আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষ্ণব কবি বর্ণিত শ্রীরাধিকার ভাবদ্যুতি সমুজ্জ্বল। সুকোমল দেহ-লাবণ্য, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সুষমাময় উপমা প্রয়োগে ও মাধুর্য প্রধান ভাবাবহ-রচনায় মুকুন্দরামের চণ্ডী বৈষ্ণবের রাধিকার সহিত অভিন্ন।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতের সমর্থনে এখানে মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গল থেকে চণ্ডীর রূপ বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। ফুল্লরা চণ্ডীর রূপ বর্ণনা করছেন:

জিনি নীলগিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকা-মালে।
বিধি কুতূহলী সুস্থির বিজুলি
প্রকাশিল কেশ জালে॥
কপোল-মণ্ডল চঞ্চল কুণ্ডল
বদন বিধু মণ্ডলে।
তব রূপ-সীমা কি দিব উপমা
নাহি তিনলোক তলে॥
কপালে সিন্দুর তম করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু
চন্দনের বিন্দু কিবা তাহে ইন্দু
হৈলা কলঙ্ক তনু॥

ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখ গন্ধে
কত শত ধায় অলি ।
তোর মুখ শশী মৃদু মন্দ হাসি
সঘনে পড়ে বিজুলি ॥
জিনি গজমোতি তোর দন্তপাঁতি
হাসিতে বিজুলী খেলে ।
পক্ক বিম্ববর জিনিয়া অধর
নাসাতে মাণিক দোলে ॥
হেমলতা তনু তোর ভুরু-ধনু
অপাঙ্গ মদন তুণে ।
কজ্জল গরল বিশিখ প্রবল
ধরসি কিবা কারণে ॥
শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম
আর কত রত্নতায় ।
বক্ষের কাঁচুলী করে ঝিলিমিলি
শোভিছে অঙ্গ-ছটায় ॥
বহুরত্না দেখি হেন মনে সখি
উর্বশী আল্য আপনি ।
কিবা আল্যরমা রম্ভা তিলোত্তমা
সাবিত্রী কিবা ইন্দ্রাণী ॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের এই বিশিষ্ট উদাহরণ থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বাংলা কাব্যে সমানই আছে। এ পর্যন্ত এই গ্রন্থে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা ও অন্যান্য বাংলা কাব্যে তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে উনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান যুগের বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব আলোচিত হবে।

৫

উনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান যুগের বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ। এই জাগরণের সার্থকতার মূলে যাঁর প্রচেষ্টা ও দান সর্বাধিক তিনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইউরোপীয় সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করার ফলেই মাইকেলের প্রতিভার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হয়েছিল; তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, মাইকেলই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যকে জাতীয় রসোপকরণের ভাণ্ডার বলে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন; তাই তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব কাব্যেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্য থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে।

গোপিনা শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

(তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)

আর কি কাঁদে লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি?

বিন্দা—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
কাথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা ।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

মধুসূদনের বৈষ্ণব প্রবণতা এত গভীর ছিল যে, তাঁর যে কোনো কবিতাতেই বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মধুসূদনের রচিত একটি কবিতাতে আছে ঃ

আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলে হরষে ;
যমুনা হয়েছে পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ?

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

মধুসূদনের বৈষ্ণব প্রবণতা সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' । তবে ব্রজাঙ্গনা কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ অনুসৃত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। ব্রজাঙ্গনা কাব্য আধুনিক গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত কতকগুলি রোমান্টিক কবিতার সমষ্টি। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা ও অনির্বচনীয়তা, তার বিরহের করুণতা এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব পদাবলীর গীতি-মাধুর্য মধুসূদনের অনুপ্রেরণার মূল। আর এই অনুপ্রেরণা কাব্য

রচনার মাধ্যমে মধুসূদন তাঁর পরবর্তী একাধিক কবির কাব্যে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

এখানে বিভিন্ন কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মধুসূদনের রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের একটি কবিতার নাম 'যমুনাতটে'। কবি হেমচন্দ্রও 'যমুনাতটে' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন।

দুটি কবিতা থেকে পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিলে একের উপরে অন্যের প্রভাব অনুমান করা সহজ হবে।

মধুসূদন 'যমুনাতটে' কবিতায় লিখেছেন :

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তবে কূলে, কল্লোলিনী, ভ্রমি আমি একাকিনী
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

* * * *

বসো আসি, শশিমুখি ! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণী !
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

কবি হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে' কবিতায় উপরোক্ত পংক্তিগুলির প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

'হেন নিশি একা আমি, যমুনার তটে বসি'
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

কে আছে এ' ভূমণ্ডলে যখন পরাণ
জীবন পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ' শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবা নিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি,
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে ॥

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের 'জলধর' শীর্ষক কবিতাটির অনুসরণ করে হেমচন্দ্রও 'জলধর' কবিতা রচনা করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিকই ছিলেন না; কবিতা ও গীত রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর কবিতাতে বৈষ্ণব পদাবলীর গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়, তবে সেগুলির মধ্যে 'ব্রজাঙ্গনা'র ভাব ও ভাষা অনুসারী রচনাও আছে। বঙ্কিমের 'কবিতা-পুস্তক' থেকে 'আশঙ্কা' কবিতাটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হল।

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল
রে প্রাণ বল্লভ।
কিবা দিবা কিবা রাতি কূলেতে অাঁচল পাতি
শুইতাম শুনিবারে তোর মৃদু রব
রে প্রাণ বল্লভ।

*　　*　　*　　*

কেননা হইলি তুই, যমুনা তরঙ্গ
মোর শ্যামধন!
দিবারাতি জলে পশি' থাকিতাম কাল শশী,
করিবারে নৃত্য দরশন ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করে কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাকাব্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন ; সেখানে কৃষ্ণচরিত্রের মহিমা বা ঐশ্বর্যের প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের মাধুর্যের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নি। কিন্তু তাঁর রচিত গীতি কবিতাগুলি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি। নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যের হৃদয় উচ্ছ্বাস কবিতাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

সখিরে !

আর কি বলব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে।
দিন দিন পল পল জ্বলিছে বিরহানল
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে॥
প্রিয় সখি মরিতেছি মরমে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাকবি ছিলেন। গীতি রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণভক্তির জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমধিক প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ বিষয়ক বা কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনে গিরিশ ঘোষ যে সব নাটক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব গভীর, তবে গীতরচনায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রভাবও লক্ষণীয়।

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে কৃষ্ণ বিরহ কাতর চৈতন্যদেবের যে চিত্র এঁকেছেন সে ছবি বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ছবি নয়, সে ছবির সঙ্গে মেলে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধার ছবি।

মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে শ্রীরাধার উক্তি :

কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?

আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?

আর কি পরিবে, কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?

গিরিশচন্দ্রের নিমাই সন্ন্যাস নাটকে শ্রীরাধার উক্তি ঃ

হে শ্যামা, যমুনা পুলিনে তোমার—
মুরলিমোহন বাজাত বাঁশী
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি
উথলিত তব লহর রাশি ।
বিরহ-বিধুরা আসি ব্রজবালা
মনেরি বেদন জানাত তোরে
জানতো সজনি বলে দেহ মোরে
কোথা গেলে পাব সে চিত-চোরে ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদনের কিছু পরবর্তী প্রায় সব প্রতিভাবান কবির কাব্য রচনায়ই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায় । ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা মাইকেল বৈষ্ণব পদাবলী থেকে পেয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, তবে তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা বোধ হয় ভারতচন্দ্রের রচনা থেকে পাওয়া । এই অনুমানের কারণ হিসাবে রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের একটি 'ধুয়া' পদ ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র একটি কবিতা পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দুটি পদের সাদৃশ্য দেখানো হল ।

কি বলিলি মালিনী, ফিরে বল বল ।
রসে তনু ডগমগ মন টলটল ॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থরথর
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছলছল ।

তেয়াগিয়া লোক লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চলচল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরয ধরে পিক কলকল ।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢলঢল ॥

(ভারতচন্দ্রের ধুয়া পদ)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার---
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

(মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

উপরোদ্ধৃত দুটি পদের অসাধারণ সাদৃশ্য এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা মাইকেল মধুসূদনের প্রায় এক শতাব্দী আগের ; এই দুই কারণে এই অনুমান অযৌক্তিক মনে হয় না যে, এই দুই মহাকবিই বৈষ্ণব পদাবলী থেকে গভীর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন. তবে মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা বোধহয় রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'ধুয়া' পদগুলি থেকে পাওয়া ।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মধ্যগগনের সূর্যের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়েছিল । সেই অসামান্য প্রতিভা বিকাশে বৈষ্ণব পদাবলীর দান কতখানি, তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার মূল উৎস গভীর প্রকৃতি-প্রেম । এই কারণে ইংরাজী রোমান্টিক কাব্য সাহিত্য থেকে তিনি অনেকখানি অনুপ্রেরণা

পেয়েছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁর প্রতিভা বিকাশের মূলে সংস্কৃত ক্লাসিক-কাব্যসাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর দানও যে বড় কম নয়, সে কথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখনই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে সুরু করেন, এবং যোল বৎসর অতিক্রম করবার আগেই একদিন মেঘ-মেদুর বাদল দিনে তাঁর হাতে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র প্রথম কবিতার জন্ম নেয়—'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।......' শুধু কাব্য রচনার ক্ষেত্রেই নয় ভগবৎচেতনা বা ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের গভীর বৈষ্ণব-প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

ঘোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের সন্তান রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম ধর্মের পরিবেশের মধ্যেই তাঁর ভগবৎচেতনার উন্মেষ; ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ তাঁর সংস্কার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, এ সবই সত্য, তবু তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বা তাঁর কাব্য রচনায় ভগবান ও মানুষের সম্পর্ক যেভাবে চরিত্র হয়েছে তা তাঁর বৈষ্ণব প্রাবণতার নিদর্শন বলেই মেনে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ একটি গানে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলছেন :

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে॥
তাইতো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি,
ফিরছ কত মনোহরণ বেশ
প্রভু, নিত্য আছ জাগি॥

তাইতো প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ॥

এই কবিতায় ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রেমের ও লীলার সম্পর্কের যে মধুর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তির মর্ম-কথা। গভীর বৈষ্ণব প্রাণতা না থাকলে বৈষ্ণব ভক্তির মর্মার্থ এত সহজ করে ব্যাখ্যা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব প্রাণতা শুধু যে ভগবৎচেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, রাধাপ্রেমের অনির্বচনীয়তা তিনি মানুষের প্রেমের গভীরতার মধ্যেও উপলব্ধি করেছিলেন : তাই তার ব্যাকুল প্রশ্নে কাব্য জগত মুখরিত :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
..   ...
সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে ?

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব প্রাণতার উদাহরণ কেবলমাত্র 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনাই নয়; রবীন্দ্রনাথ যখনই মানব-প্রেমের গভীরতা বা ভগবৎপ্রেমের অনির্বচনীয়তার কথা বলেছেন, তখনই সে প্রকাশ ভাবলোকের এমন স্তরে পৌঁছেচে, যেখানে একমাত্র মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার প্রেম পৌঁছুতে পেরেছিল। সে প্রেমের ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় :

সখি ! কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।

'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, গীত মূর্চ্ছনা সব কিছুই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল ; তাই বৈষ্ণব পদাবলীর রচনারীতি ও অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য—এই দুই-এর গভীর প্রভাব রবীন্দ্র কাব্যে লক্ষিত হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বিংশ শতাব্দী পুরাপুরি আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাই কমল' বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য সিঞ্চিত একটি করুণ মধুর উপন্যাস। 'রাই কমলে'র চরিত্রটি বৈষ্ণব পদাবলীর একটি গান। তাই উপন্যাসের জায়গায় জায়গায় বৈষ্ণব পদাবলীর অংশ উদ্ধৃত করে তারাশঙ্কর 'রাই কমলে'র চরিত্র মাধুর্য প্রকাশ করেছেন :

"মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্বের রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সেই রাইকমল। নিজেকে দেখিয়া সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া যায়। সেদিন সে গুন গুন করিয়া গান ধরে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর॥

অজয়ের নির্জন তীর, নিজের গান সে নিজেই শোনে। সব সারিয়া গাছ তলার ঘর ভাঙ্গিয়া আবার সে পথ চলে।"

এরপর আর একটি উদাহরণে এ গ্রন্থের উপসংহার। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব পদাবলীর 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী'র মানবী-প্রেয়সীতে রূপান্তরের

যেটুকু বাকী ছিল, অতি আধুনিক যুগের কবি অন্নদাশঙ্করের হাতে সে রূপান্তর পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর নূতন রাধার 'রাধা' কবিতায় তার স্পষ্ট প্রকাশ :

ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
শীতল জানিয়া তোমার ও দুটি চরণে পাড়নু বাঁধা।
কত জনে কত দেবতা মিলয় যেমন যাহার রুচি
কেহ গড়ে লয় কেহ খুঁজে পায় পণ্ডিত জনে পুছি।
কত না আয়াসে ওরা তো করিল রহস্য পরিমাণ
আপনা হইতে মোরে মিলি গেল সুন্দরী ভগবান।
সুন্দরী ভগবান গো আমার সুন্দরী মোর নারী
সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে লয়ে সুধা ঝারি।
দেবতার পদ প্রক্ষালি কেহ সে জলে মিটায় ক্ষুধা।
আমার তিয়াসা ধন্য করিল নারী কণ্ঠের সুধা॥

* * * *

সৃষ্টি সে আসি শেষ হয়ে গেছে তোমার দুগাছি কেশে
অনন্ত কাল বিকশি উঠেছে তোমার অধরে হেসে।
কোথা হতে তুমি আসিবে কেন গো তুমি তো আদির আদি
আপন আগুনে ফাগুন করেছ সৃষ্টির মায়া কাঁদি।
ওগো মায়াবিনী, ওগো মায়াবিনী রাধা—
গোরোচনা গোরা অঙ্গে তোমার সৃষ্টির মায়া কাঁদা।
ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
বলো, কবে মোর হবে সমাপন বাঁশরির সুর সাধা।
বাঁশরির সুরে কাঁদা গো আমার কারে পাইবার আশা
কারে পাইবার কাহারে দিবার কার হইবার আশা!

* * * *

জিনিব সহজ জয়ে গো, বন্ধু জিনিব তোমারে শেষে
ধূলার চাইতে রিক্ত হইয়া বাহিরিব বরবেশে।

ওগো একাকিনী, ওগো একাকিনী রাধা—
কেহ নাহি জানে তুমি আর আমি কেনে অবাঁধনে বাঁধা ॥

একটি উপযুক্ত উদ্ধৃতিতে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

"কৃষ্ণ কলঙ্কে কলঙ্কী হইবার শ্লাঘা, এই যে রসের সাধনায় বিশ্ব মানবতার পরিকল্পনা—ইহা বাঙালীর নিজস্ব। বাঙালীর প্রাণের কথা হইলেও আজ বাঙালী পাঠককে তাহা বলিবার জো নাই! সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনা পুলিন, সেই অভিসার যাহা বৈষ্ণবগণ প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে এতই সুলভ হইয়া পড়িয়াছে, যে এখনকার সমস্ত কবিরই হৃদয়ে যমুনা বহিতেছে আর তাঁহাদের মানস সুন্দরী যেখানে অভিসার করিতেছেন।" (কাব্য রত্নমালা : বিভূতিভূষণ মিত্র, পৃঃ ১)।

বলা বাহুল্য যে সুপ্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করে এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছে পরিসমাপ্তিতে উপরোক্ত উদ্ধৃতটি সেই প্রবাদ 'কানু বিনা গীত নাই'-এরই প্রতিধ্বনি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আদিযুগ থেকে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পাঠ করলে শ্যামের বাঁশির সুরই কানে বাজে, আর মনে ভাসে শ্রীমতীর অভিসারের ছবি। ঘোর অন্ধকার রাত্রি—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো পথ দেখায়—শ্রীরাধা চলেছেন অনন্ত অভিসারের পথে—নীল শাড়ি দিয়ে তনু দেহটি ঘেরা পায়ে নূপুরের রুনুঝুনু; কবরীতে জড়ানো মল্লিকার মালার সুরভিতে দশদিক আমোদিত। সমস্ত দুর্যোগ উপেক্ষা করে শ্রীমতী চলেছেন—সখিরা বাধা দিয়েছিল।

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার ?
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

শ্রীরাধিকা সবই জানেন কিন্তু দুরূহ দুর্গম পথকে তাঁর ভয় নেই, পথ চলার ক্লান্তিও তাঁর নেই। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ মিলনের প্রত্যাশায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তাই সখিদের প্রশ্নে তাঁর উত্তর :

সখি ! মোহে পরিখন কর দূর
কৈছে হৃদয়ে করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ।

নিখিল বিশ্বের সর্বস্ব হরি যে শ্রীমতীর জন্য নিভৃত কুঞ্জে অপেক্ষা করে আছেন ; সেই জন্যই তো তাঁর উন্মত্ত অভিসার । পথের বাধায় শ্রীমতীর শঙ্কা নেই, মন প্রাণ তো বহু আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে লীন হয়ে আছে । বাইরের বাধায় তিনি বিচলিত হবেন কেন ? পথের দুরন্ত দুরূহতায় বা তাঁর শঙ্কা কিসের ? 'যোজন মন মাহ'—মনের কাছে যোজন পথ দূর নয় ।

বৈষ্ণব পদাবলীই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ । পরমকৃষ্ণভক্ত মহাকবি জয়দেবের প্রসাদে বাঙালী এই অনির্বচনীয় সম্পদের অধিকারী হয়েছে ; তাই সেই শ্রুতকীর্তি সাধক কবির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলি ঃ

যদি হরি স্মরণে সরসঃ মনো
যদি বিলাস কলাসুকুতূহলম্
মধুর কান্ত কোমল পদাবলীং
শৃণু তথা জয়দেব সরস্বতীম্ ।

আর তাঁরই মধুর ভাষায় শ্রীমতীর প্রাণ বল্লভের জয়গান করি—
'জয় জগদীশ হরে' ।